ইতিহাস
তৃতীয় ভাগ

ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

(পঞ্চম শ্রেণীর জন্য)

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স বিল্ডিংস্
কলিকাতা ৭০০ ০০১

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৬৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৬৭
তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৬৯
চতুর্থ মুদ্রণ ফেব্রুআরি ১৯৭৪
পঞ্চম মুদ্রণ জানুআরি ১৯৭৫
ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
সপ্তম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
অষ্টম মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৭৭
নবম মুদ্রণ অগস্ট ১৯৭৮
দশম মুদ্রণ ফেব্রুআরি ১৯৮০
একাদশ মুদ্রণ ফেব্রুআরি ১৯৮১
দ্বাদশ মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৮২
ত্রয়োদশ মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৮৩

মুদ্রণ :
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন)
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

নিবেদন

অল্পমূল্যে সহজবোধ্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ইতিহাস তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। অনুমোদিত পাঠক্রম অনুসরণ করেই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। সহজ ও সরল ভাষায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কিশোর মনের উপযোগী করে পরিবেষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো অনিবার্য ভুল-ত্রুটির সংশোধন এবং পুস্তকটির উন্নতিকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌-গণের অভিমত পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় যথাযথ বিবেচিত হবে।

যাঁরা এই পুস্তক রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন শিক্ষা-অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
কলিকাতা

শিক্ষা-অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

বাবর ৫
শের শাহ্ ১২
আকবর ১৮
রানা প্রতাপসিংহ ৩০
বাংলার বীর ৩৬
শাহজাহান ৪২
আওরঙ্গজেব ৪৯
শিবাজী ৫৫
মুঘল যুগে ভারত ৬২
ভারতে ইউরোপীয় বণিক্ ৬৬
সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাসিম ৭১
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—ওআরেন হেস্টিংস ৭৭
হায়দর আলি ও টিপু সুলতান ৮২
রণজিৎ সিংহ ৮৬
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ৮৯
স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন ৯৪

ইতিহাস

বাবর

দিল্লির সুলতানী আমলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী তোমরা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েছ। রাজপুত বীর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে মোহাম্মদ ঘোরী দিল্লিতে মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লির তুর্কী ও আফগান (বা পাঠান) রাজগণের উপাধি ছিল সুলতান। তিনশত বৎসরের অধিক কাল দিল্লিতে তাঁদের রাজত্ব ছিল। এক সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লির সুলতানগণের অধীন হয়েছিল। পরে নানা কারণে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়েছিল খেয়ালী সুলতান মোহাম্মদ বিন্ তুঘলকের আমলে। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত সমরকন্দের অধিপতি তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৈমুরের একটি পা ছিল খোঁড়া, তাই তাঁকে 'লঙ্গ' (অর্থাৎ খোঁড়া) বলা হত। তিনি বাহুবলে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদল দিল্লি অধিকার করে বহু লোক হত্যা করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা তৈমুরের ছিল না; প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে তিনি স্বদেশে ফিরে গেলেন। দিল্লির সুলতানদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হল, তাঁদের সাম্রাজ্য উত্তর ভারতে একটি ছোট রাজ্যে পরিণত হয়। তৈমুরের আক্রমণের শতাধিক বর্ষ পরে

তাঁর বংশধর বাবর সুলতানী আমলের অবসান ঘটিয়ে দিল্লিতে মুঘল বাদশাহি স্থাপন করলেন।

তৈমুরলঙ্গ

প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়ায় হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে ফরঘনা নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যে তৈমুরের বংশধরগণ রাজত্ব করতেন। ফরঘনার সুলতান ওমর শেখ মির্জার পুত্র

ছিলেন বাবর। বাবরের মা ছিলেন প্রসিদ্ধ মোঙ্গল বীর দিগ্বিজয়ী চিঙ্গিজ খাঁর বংশের কন্যা। সুতরাং বাবা ও মায়ের দিক্ থেকে বাবর ছিলেন সেকালের দুই শ্রেষ্ঠ বীরের বংশধর। তুর্কী ভাষায় 'বাবর' শব্দের অর্থ 'সিংহ' বা 'ব্যাঘ্র'। বাবর নানা যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসের

বাবর

পরিচয় দিয়ে এই নাম সার্থক করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জহীরউদ্দীন মোহাম্মদ।

রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বাবর প্রথম জীবনে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন এগার বৎসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিন বৎসর ফর্ঘনায় রাজত্ব করবার পর চৌদ্দ বৎসর বয়সে

বাবর তৈমুরলঙ্গের রাজধানী, মধ্য এশিয়ার প্রসিদ্ধ নগর সমরকন্দ অধিকার করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দুর্দান্ত উজবেগদের আক্রমণে ফরঘনা ও সমরকন্দ থেকে তিনি বিতাড়িত হন; কিন্তু এই বিপদেও রাজ্যহারা বাবর নিজের উপর বিশ্বাস হারালেন না। কয়েক বৎসর পরে তিনি অসামান্য সাহস ও বুদ্ধির বলে কাবুল অধিকার করলেন। তারপর তিনি দখল করলেন গজনী ও কান্দাহার। উত্তর ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে বাবরের নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

আফগানিস্তানের পাশেই ভারতবর্ষ। কাবুলের সিংহাসনে বসে বাবর ভারতবর্ষ অধিকার করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তিনি মনে করতেন যে, তৈমুরের বংশধর হিসাবে দিল্লির সিংহাসনের উপর তাঁর দাবি আছে, কারণ তৈমুর দিল্লি দখল করেছিলেন। এই সময়ে দিল্লির পাঠান সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। তিনি বড়ই অহঙ্কারী ছিলেন, তাঁর ব্যবহারে রাজ্যের বড় বড় আমীর-ওমরাহেরা তাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী সুলতান ইব্রাহিমকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য অনুরোধ করলেন। লোদী সুলতানের দুর্বলতায় উৎসাহিত হয়ে বাবর পর পর চার বার পঞ্জাব আক্রমণ করেন।

শেষবার দিল্লির নিকট পাণিপথ নামক স্থানে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর ঘোর যুদ্ধ হয়। সে সময় ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহে কামানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, কিন্তু বাবরের সঙ্গে কয়েকটা কামান ছিল। ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য বাবরের সৈন্যের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল; তবু প্রধানত কামানের সাহায্যে বাবরই জয়লাভ করলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যু হল, লোদী বংশের এবং সুলতানী রাজ্যের পতন ঘটল এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হল।

বাবর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মতো লুণ্ঠনকারী ছিলেন না, ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পাণিপথে জয়লাভের পর তিনি দিল্লি এবং আগ্রা অধিকার করলেন। উত্তর ভারতের অধিকাংশ তখন বিভিন্ন পাঠান দলপতি ও হিন্দু রাজগণের অধীন ছিল। বাবর যখন নিজের রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করলেন তখন এই সকল খণ্ড রাজ্যের অধিপতিগণের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বাধা দিলেন।

এই সময়ে উত্তর ভারতে হিন্দু রাজাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বিখ্যাত ছিলেন চিতোরের রানা সংগ্রামসিংহ। তাঁর সাহস ও বীরত্বের তুলনা ছিল না। তিনি বার বার অন্যান্য রাজপুত রাজাদের সঙ্গে এবং প্রতিবেশী মালব ও গুজরাটের সুলতানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। নানা যুদ্ধে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তাঁর দেহে আশিটা আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে প্রবাদ আছে। মেবার ছিল তাঁর পৈতৃক রাজ্য। মেবারের বাইরে রাজপুতানার অন্য কয়েকটি রাজ্যও তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। তাঁর আশা ছিল যে পাঠান রাজত্ব ধ্বংস হলে তিনি উত্তর ভারতে আবার হিন্দু-প্রভুত্ব স্থাপন করবেন। বাবর লোদী বংশ ধ্বংস করে ধনরত্ন নিয়ে তৈমুরলঙের মতো স্বদেশে ফিরে গেলে সংগ্রাম-সিংহের স্বপ্ন হয়তো সফল হত। কিন্তু বাবর দিল্লি ও আগ্রায় নিজের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে চারদিকে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন সংগ্রাম সিংহ বুঝলেন যে বাবর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করলে হিন্দু-রাজ্য পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা থাকবে না। তাই তিনি নিজের সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাবরকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াবার

আয়োজন করলেন। রাজপুতানার কয়েকজন রাজা এবং উত্তর ভারতের কয়েকজন পাঠান দলপতি তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। আগ্রার কাছে খানুয়া নামক স্থানে বাবর ও সংগ্রামসিংহের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। সংগ্রামসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতেরা খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন বাবর। পরাজয়ের গ্লানি সংগ্রামসিংহের পক্ষে অসহ্য হল, খানুয়ার যুদ্ধের অল্পদিন পরেই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করলেন।

সংগ্রামসিংহের পরাজয়ের পর বাবরের সঙ্গে বিহারের পাঠান দলপতিগণের সংঘর্ষ হল। আবার বাবর জয়লাভ করলেন, তাঁর নূতন সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হল। কিন্তু ভারতবর্ষে মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করবার পর অকালে তাঁর মৃত্যু হল।

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বাবরের ন্যায় সাহসী ও গুণবান্ রাজার কাহিনী বেশী পাওয়া যায় না। অসামান্য বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি সুদূর মধ্য এশিয়া থেকে এসে ভারতবর্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। তিনি যে কেবল যোদ্ধা ছিলেন তা' নয়, তিনি বেশ লেখাপড়া জানতেন এবং ফারসী ভাষায় সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। তিনি নিজের মাতৃভাষা তুর্কীতে নিজের জীবন-চরিত লিখেছিলেন। এই বইতে বাবর নিজের জীবনের সকল কথাই সরল ও স্পষ্টভাবে বলেছেন, নিজের দোষ ও ব্যর্থতার কথাও গোপন করেন নাই।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁর মৃতদেহ কাবুলে প্রেরিত হয়। সেখানে তাঁর কবরের উপরে শতাধিক বৎসর পরে সম্রাট্ শাহজাহান একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ
- —১১৯২ পৃথ্বীরাজের পরাজয় : সুলতানী সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন
- —১৩৫১ মোহাম্মদ বিন্‌ তুঘলুকের মৃত্যু
- —১৩৯৮ তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ
- —১৪৮৩ বাবরের জন্ম
- —১৪৯৪ বাবরের পিতৃবিয়োগ ও রাজ্যলাভ
- —১৫০৪ বাবরের কাবুল অধিকার
- —১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ : মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন
- —১৫২৭ খানুয়ার যুদ্ধ
- —১৫৩০ বাবরের মৃত্যু

আলোচনা

১। তৈমুরলঙ্গ কে? তিনি কি উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন?
২। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ কি?
৩। সংগ্রামসিংহের উদ্দেশ্য কি ছিল, কেন তা' ব্যর্থ হল?
৪। বাবরের চরিত্রে কি কি গুণ ছিল?
৫। সমরকন্দ, কাবুল, পাণিপথ, দিল্লি—মানচিত্রে এই স্থানগুলি দেখাও এবং এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝিয়ে দাও।

শের শাহ্

বাবরের মৃত্যুর পর দিল্লির বাদশাহী সিংহাসনে বসলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। কিন্তু তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজ্য হারিয়ে পারস্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। হুমায়ুন পিতার ন্যায় সাহসী হলেও উদ্যমশীল ও সুচতুর ছিলেন না। তাঁর তিন ভাই তাঁর সঙ্গে বারবার শত্রুতাচরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে বাবর তাঁর নূতন রাজ্য সুশাসনের পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার সময় পান নাই। হুমায়ুনের দুর্বলতার সুযোগে পাঠান বীর শের শাহ্ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করলেন।

শের শাহের জীবন-কাহিনী উপকথার মতো বিচিত্র। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল ফরিদ খাঁ। নিজের হাতে একটি বৃহৎ 'শের' বা ব্যাঘ্র হত্যা করে তিনি বিহারের সুলতানের অনুগ্রহে 'শের খাঁ' উপাধি লাভ করেন। তিনি শূরবংশীয় আফগান বা পাঠান ছিলেন। তাঁর পিতা হাসান খাঁ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গিরদার ছিলেন। বিমাতার চক্রান্তে ফরিদকে বাল্যে ও কৈশোরে নানারকম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি অল্পবয়সে সাসারাম থেকে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরে চলে যান এবং সেখানে আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

জৌনপুরে শিক্ষা শেষ হলে ফরিদ সাসারামে ফিরে এসে কিছুদিন পিতার জায়গিরের তত্ত্বাবধান করেন, কিন্তু বিমাতার ষড়যন্ত্রে তাঁকে

অল্পদিন পরে বিহার পরিত্যাগ করতে হয়। তিনি আগ্রায় গিয়ে লোদী সুলতানের দরবারে চাকরি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হল এবং তিনি সাসারামে ফিরে এসে পৈতৃক জায়গির দখল করলেন; কিন্তু জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রে তিনি বেশীদিন এই সম্পত্তি

হুমায়ুন

ভোগ করতে পারলেন না। সাসারাম ত্যাগ করে তিনি বিহারের পাঠান সুলতানের নাবালক পুত্র জালাল খাঁর শিক্ষকের পদ লাভ করলেন। কিছুদিন পরে তিনি মুঘল সম্রাট্ বাবরের অধীনে কর্মগ্রহণ করলেন। বাবরের অনুগ্রহে তিনি জ্ঞাতিশত্রুদের হাত থেকে পৈতৃক জায়গির উদ্ধার করলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই শের খাঁ বাবরের দরবার থেকে কর্মচ্যুত হয়ে বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর ছাত্র জালাল খাঁ বিহারের সুলতান হয়েছিলেন। শের খাঁ এই নাবালক সুলতানের অভিভাবকের পদ লাভ করলেন কিন্তু এখানেও তাঁর শত্রুর অভাব হল না; বিহারের বড় বড় ওমরাহেরা সুলতানের দরবাবে শের খাঁর প্রভাব সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা নাবালক সুলতানকে হস্তগত করে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহের সঙ্গে মিলিত হলেন। দুই সুলতানের সৈন্যদল শের খাঁকে আক্রমণ করল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে সুরজগড় নামক স্থানে যুদ্ধ হল। শের খাঁ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে বিহারে রাজত্ব করবার অধিকার পেলেন। সাসারামের জায়গিরদার বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে হলেন বিহারের অধিপতি। কিন্তু শের খাঁর উচ্চাভিলাষ এখানেই শেষ হল না, তিনি রাজ্যবিস্তারের সঙ্কল্প নিয়ে বাংলা দেশ আক্রমণ করলেন।

যখন পূর্ব ভারতে শের খাঁ বাহুবলে পাঠান-রাজত্ব স্থাপন করেন তখন পশ্চিম ভারতে মুঘল সম্রাট্ হুমায়ুন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। শের খাঁর আকস্মিক ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে হুমায়ুন তাঁকে দমন করবার জন্য গুজরাট থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন। মুঘল সৈন্যদল বিহারে ও বাংলা দেশে উপস্থিত হল, কিন্তু কৌশলী শের খাঁ সম্রাটের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে শক্তিক্ষয় করলেন না। তিনি মুঘল সৈন্যদলের পাশ কাটিয়ে বিহারের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত দুর্ভেদ্য রোটাস দুর্গ এবং বারাণসী অধিকার করলেন। এই সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন বাংলা দেশ থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। শের খাঁ আর সম্মুখ যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করলেন না। ক্রমান্বয়ে দুইটি যুদ্ধে—বর্তমান উত্তর প্রদেশে অবস্থিত চৌসা ও কনৌজে—তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করলেন। কিছুদিন

পরে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লিও শের খাঁর হস্তগত হল। পরাজিত হুমায়ুন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বিজয়ী শের খাঁ 'শাহ্' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করলেন। মুঘল বাদশাহি পাঠান বাদশাহিতে পরিণত হল।

শের শাহ্ মাত্র পাঁচ বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পঞ্জাব ও মালব অধিকার করেন এবং বাংলায় বিদ্রোহ
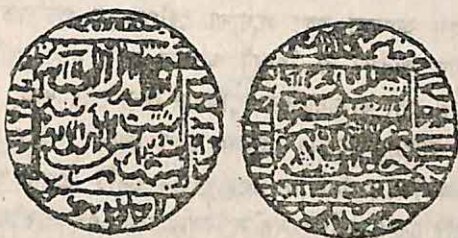
শের শাহের মুদ্রা

দমন করেন। মারবাড়ের শক্তিশালী রাজপুত রাজা মালদেব তাঁর কাছে পরাজিত হন। মধ্যভারতে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ কালে আহত হয়ে শের শাহ্ অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

শের শাহ্ শুধু যে সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন তা' নয়; শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আবার প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে একটি পরগনা গঠিত হত। শের শাহের নির্দেশে

সমগ্র সাম্রাজ্য জরিপ করা হয় এবং প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর রূপে ধার্য করা হয়। শের শাহ্ জমিদার ও প্রজার অধিকার ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। তিনি ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করেন, দুষ্ট রাজকর্মচারীদের অত্যাচার দমন করেন এবং শান্তি রক্ষার জন্য পুলিস বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। মুসলমান রাজত্বকালে তাঁর মতো সুশাসক কমই ছিলেন।

শের শাহের আমলে বহু সুদৃশ্য রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। ঐ সকল মুদ্রায় ফারসী ও হিন্দী অক্ষরে তাঁর নাম খোদিত ছিল। বাণিজ্যের প্রসার এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য শের শাহ্ রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। বাংলা দেশ থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ তিনি নির্মাণ করেছিলেন সেটি এখন 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামে পরিচিত। পথিকদের সুবিধার জন্য এই সুদীর্ঘ রাজপথের স্থানে স্থানে পান্থশালা নির্মিত হয়েছিল। ধর্ম সম্বন্ধে শের শাহের মত ছিল উদার। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। ব্রহ্মাজিৎ গৌড় নামক তাঁর একজন বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতি ছিলেন।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ্ কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর শের শাহের আত্মীয়গণের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ আরম্ভ হয়। সেই সুযোগে হিমু নামক একজন হিন্দু সেনাপতি খুব ক্ষমতাশালী হন। পাঠানদের মধ্যে যখন সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিল তখন হুমায়ুন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। আবার দিল্লিতে পাঠানশাসনের অবসান ঘটল, মুঘল বাদশাহি পুনরায় স্থাপিত হল।

খ্রিস্টাব্দ	—১৫২৬	পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ
	—১৫২৬-৩০	বাবরের রাজত্বকাল
	—১৫৩০-৪০	হুমায়ুনের রাজত্বকাল
	—১৫৩৯	চৌসার যুদ্ধ
	—১৫৪০	কনৌজের যুদ্ধ
	—১৫৪০-৪৫	শের শাহের রাজত্বকাল
	—১৫৪৫-৫৩	ইসলাম শাহের রাজত্বকাল
	—১৫৫৫	হুমায়ুনের দিল্লি ও আগ্রা অধিকার

আলোচনা

১। হুমায়ুন রাজ্য হারিয়েছিলেন কেন?
২। শের শাহ্ কিরূপে রাজ্যস্থাপন করেন?
৩। শের শাহের চরিত্রে কি কি গুণ ছিল?
৪। শের শাহ্‌কে সুশাসক বলা হয় কেন?

আকবর

হুমায়ুন যখন শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পারস্য দেশের দিকে যাত্রা করেন তখন পথে সিন্ধু দেশের অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে তাঁর প্রথম পুত্র আকবরের জন্ম হয়। এমন আনন্দের সময় অনুচরদিগকে কিছু উপহার দেবার ক্ষমতা রাজ্যচ্যুত বাদশাহের ছিল না, তিনি তখন একেবারে নিঃস্ব। তাঁহার সঙ্গে একটু কস্তুরী ছিল। তিনি অনুচরদের মধ্যে কস্তুরীটুকু বিতরণ করে বলেছিলেন, "এই কস্তুরীর সুগন্ধের মতো আমার পুত্রের সুখ্যাতি যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।" হুমায়ুনের আশা পূর্ণ হয়েছিল—ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আকবরের যশ সত্যই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাল্যকালে আকবর অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন। হুমায়ুনের ভাইয়েরা নানারকমে তাঁর ক্ষতি করতেন, কিন্তু রাজ্যহারা হুমায়ুন তাঁদের কাছেই নাবালক আকবরকে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে ও রাজনৈতিক গোলযোগে বিব্রত থাকায় হুমায়ুন পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি। কিন্তু সর্বদা বিপদ্ ও কষ্টের মধ্যে থাকায় আকবর অল্প বয়সেই সাহস, সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণ অর্জন করেছিলেন। পুঁথিপত্রের শিক্ষায় বঞ্চিত থেকেও তিনি কর্মক্ষেত্রে অসামান্য যোগ্যতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শের শাহের বংশধরগণের হাত থেকে দিল্লি ও আগ্রা উদ্ধার করবার ছয় মাস পরেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। তখন আকবরের বয়স চৌদ্দ

বৎসর মাত্র। রাজকার্যে অনভিজ্ঞ এই বালকের উপর রাজ্যরক্ষার ভার পড়ল। হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু বৈরাম খাঁ ছিলেন তাঁর অভিভাবক।

শের শাহের আত্মীয় পাঠান বংশীয় মোহাম্মদ আদিল শাহ্ ছিলেন দিল্লির সিংহাসনের দাবিদার। হিমু নামক তাঁর একজন সুদক্ষ হিন্দু সেনাপতি ছিলেন। নাবালক আকবরকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য হিমু সসৈন্যে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। দিল্লির মুঘল শাসন-কর্তাকে পরাজিত করে হিমু উপস্থিত হলেন পাণিপথে। সেখানে বৈরাম খাঁ তাঁকে পরাজিত করলেন। দিল্লিতে পাঠান-রাজত্ব পুনরায় স্থাপন করার সম্ভাবনা একেবারে বিনষ্ট হল। আকবরের সিংহাসন নিরাপদ হল।

হুমায়ুন কেবলমাত্র দিল্লি ও আগ্রা মুঘল অধিকারে এনেছিলেন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর বৈরাম খাঁ আকবরের পক্ষে রাজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হলেন। রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর, মধ্যভারতে গোয়ালিয়র এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত জৌনপুর অধিকার করলেন।

আকবরের বয়স কম বলে বৈরাম খাঁ তাঁর নামে নিজেই রাজ্যশাসন করতেন। ১৮ বৎসর বয়সে আকবর স্বহস্তে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করলেন। বৈরাম খাঁ এই ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে বিদ্রোহী হলেন। আকবর তাঁকে পরাজিত করলেন, কিন্তু তাঁর অপরাধ ক্ষমা করা হল। বৈরাম খাঁ মুঘল রাজবংশের যে উপকার করেছিলেন তা' স্মরণ করে আকবর তাঁকে শাস্তি দিলেন না। বৈরাম খাঁ মক্কা যাত্রা করলেন। পথে একজন পাঠান ব্যক্তিগত আক্রোশ বশত তাঁকে হত্যা করল।

আকবর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালের অধিকাংশ সময়ই তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। বাহুবলে

সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের এক অংশ তিনি অধিকার করেছিলেন। বিজয়ী আকবরের নাম ইতিহাস মনে রেখেছে, কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের কীর্তি-কাহিনীও বেঁচে রয়েছে।

মেবারের রানা প্রতাপসিংহের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধের কথা পরে বলা হবে। আকবর কেবল যে এই রাজপুত বীরের কাছেই বাধা পেয়েছিলেন তা' নয়; সেকালের দুই বীরাঙ্গনা—রানী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা—তাঁকে খুবই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কেবল পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও সেকালে তরবারি গ্রহণ করতেন।

বর্তমান মধ্যভারতের উত্তর ভাগে তখন গড়মণ্ডল নামে একটি ছোট হিন্দু-রাজ্য ছিল। আকবরের সময়ে রানী দুর্গাবতী তাঁর নাবালক পুত্রের নামে ঐ রাজ্য শাসন করতেন। স্ত্রীলোক হলেও বুদ্ধিতে ও বীরত্বে তিনি কোন পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না। গড়মণ্ডল রাজ্য চিরদিনই স্বাধীন ছিল, কখনও দিল্লির বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে নাই। আকবর অনেক সৈন্যসামন্তসহ এক সেনাপতিকে রানী দুর্গাবতীর রাজ্য অধিকার করতে পাঠালেন। বিশাল মুঘল বাহিনীকে বাধা দেবার শক্তি রানী দুর্গাবতীর ছিল না। তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করল; তিনি নিজে আহত হলেন। অবশেষে জয়লাভের আর উপায় নাই দেখে রানী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। গড়মণ্ডল রাজ্য আকবরের অধীন হল বটে, কিন্তু রানী দুর্গাবতীর নাম ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করল।

আকবরের রাজত্বকালের শেষভাগে আর এক বীরাঙ্গনা তাঁর সৈন্য-দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নাম চাঁদ সুলতানা।

আকবরের সময় দাক্ষিণাত্যে চারটি প্রধান মুসলমান-রাজ্য ছিল—

খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত অধিকার করে তিনি দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। খান্দেশের সুলতান বিনা যুদ্ধে তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন। তখন আকবরের সৈন্যদল আহম্মদনগর রাজ্য আক্রমণ করল। এই রাজ্যের সুলতান

চাঁদ সুলতানা

ছিলেন নাবালক, তাঁর অভিভাবিকা ছিলেন তাঁর পিসি—বিজাপুরের রাজকুলবধূ চাঁদ সুলতানা। চাঁদ সুলতানা সাহসে ও বুদ্ধিতে রানী দুর্গাবতীর মতো ছিলেন। মুঘল বাহিনী তাঁর কাছে প্রচণ্ড বাধা পেল।

তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে মুঘলদের আক্রমণ ব্যর্থ করলেন।

কিছুদিন পরে আহম্মদনগর রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশ আকবরের হস্তগত হল। তখন আহম্মদনগরে নানা রকম গোলমাল শুরু হল। কয়েকজন প্রধান ওমরাহ্ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাঁদ সুলতানাকে হত্যা করলেন। সুযোগ বুঝে আকবর আবার আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন। এবার আহম্মদনগর শহর মুঘল বাহিনীর হস্তগত হল। কিছুদিন পরে খান্দেশ রাজ্যে আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকবরের রাজত্বকালে গুজরাট, বাংলা দেশ এবং উড়িষ্যা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গুজরাটে প্রচুর সম্পদ্ ছিল, কিন্তু সুশাসনের অভাবে রাজ্যটি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। রাজ্যের বড় বড় লোকদের মধ্যে দলাদলি ছিল। এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আকবর গুজরাট আক্রমণ করলেন। দু'বার আক্রমণের ফলে গুজরাটে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হল।

গুজরাট জয়ের পর মুঘল সৈন্যদল বাংলা দেশ আক্রমণ করল। তখন বাংলার স্বাধীন অধিপতি ছিলেন পাঠানবংশীয় দায়ুদ খাঁ। মুঘলদের আক্রমণে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হল। বাংলা দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হল। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অংশে কিছুকাল ক্ষমতাশীল হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের ক্ষমতা প্রবল ছিল। এই জমিদারদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা ইতিহাসে 'বার ভুইঞা' নামে পরিচিত।

বঙ্গবিজয়ের দীর্ঘকাল পরে আকবর উড়িষ্যা দখল করেন। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং আফগানিস্তানের অন্তর্গত কাবুল ও কান্দাহার আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিল।

আকবরই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। শের শাহের বংশের পতনের পর হুমায়ুন কেবলমাত্র পঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রা ছাড়া ভারতের অন্য কোন অঞ্চল অধিকার করবার সময় পাননি। আকবর বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে বাড়িয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। নেপাল, সিকিম, ভুটান ও আসাম আকবরের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। সমগ্র উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ, বেলুচিস্তান এবং আফগানিস্তানের অধিকাংশই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শের শাহের সাম্রাজ্য আকবরের সাম্রাজ্যের তুলনায় আকারে অনেক ছোট ছিল। দীর্ঘকাল পরে আকবর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃস্থাপন করেছিলেন।

আকবর জানতেন যে কেবলমাত্র যুদ্ধ দ্বারা স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠন করা যায় না; সাম্রাজ্য স্থায়ী ও শক্তিশালী করতে হলে সুশাসন-প্রবর্তন করে প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি আকবরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের বন্দোবস্ত করেছিলেন।

মুঘল আমলে সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালিত হত। সম্রাটের ইচ্ছায় বাধা দিবার অধিকার মন্ত্রীদের বা প্রজাদের ছিল না। একালের গণতন্ত্র সেকালের ভারতবর্ষে অজানা ছিল। কিন্তু আকবরের মতো প্রজাপালক সম্রাটের আমলে জনসাধারণের উপর অত্যাচার হত না।

আকবর শাসনকার্য পরিচালনায় কয়েকজন মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁকে রাজকার্যে সাহায্য করতেন। এঁরা 'মনসবদার' নামে পরিচিত ছিলেন। মনসবদারগণ অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিজ নিজ মর্যাদা ও দায়িত্ব

অনুসারে তাঁরা রাজকোষ থেকে নগদ বেতন পেতেন। যুদ্ধের সময় তাঁরা সসৈন্যে সম্রাটের সৈন্যদলে যোগদান করতেন।
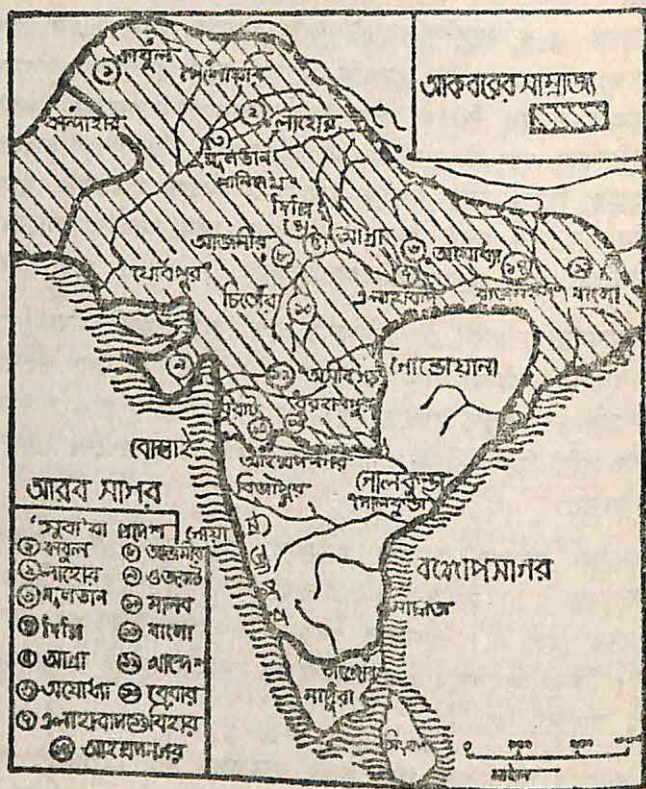
শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবরের বৃহৎ সাম্রাজ্যকে পনরটি 'সুবা' বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। এই পনরটি সুবার নাম—কাবুল,

লাহোর, মুলতান, দিল্লি, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, গুজরাট, মালব, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা, খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর। প্রত্যেক সুবায় 'সিপাহ্সালার' বা 'নাজিম' নামে একজন শাসনকর্তা ছিলেন; তাঁকে 'সুবাদার'ও বলা হত। আবার প্রত্যেক সুবায় রাজস্ব আদায় ও হিসাব-নিকাশের জন্য একজন 'দেওয়ান' থাকতেন। প্রত্যেক সুবা কয়েকটি 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলার প্রধান শান্তিরক্ষক ছিলেন 'ফৌজদার'। মামলা-মকদ্দমার বিচার করতেন 'কাজী' ও 'মুফ্‌তি'। বড় বড় শহরে 'কোতোয়াল' শান্তিরক্ষা করতেন।

আকবর রাজস্ব বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন রাজা তোডরমল। শের শাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আকবর জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। উর্বরতা অনুসারে কৃষিকার্যের উপযুক্ত জমি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর রূপে নেওয়া হত। প্রজারা ইচ্ছামতো নগদ টাকা বা শস্য দ্বারা রাজকর দিতে পারত। আকবর অনেক রকম করে ও শুল্ক তুলে দিয়ে প্রজাদের হিতসাধন করেছিলেন।

আকবর সাম্রাজ্য শাসনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করতেন না। তিনি জানতেন যে হিন্দুর সাহায্য ছাড়া সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না, হিন্দুকে মুঘল-শাসনের অনুরাগী না করলে সাম্রাজ্য শক্তিশালী হবে না। তিনি নিজেকে হিন্দু মুসলমান সকল প্রজার শাসক ও পোষক বলে মনে করতেন। সকল বিষয়ে হিন্দুদিগকে মুসলমানদের সমান অধিকার দিয়ে তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তিনি গুণবান্ হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। রাজা তোডরমল আকবরের সেনাপতি ও রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বরের রাজা মানসিংহ তাঁর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। হলদীঘাটের যুদ্ধে মানসিংহ চিতোরের রানা প্রতাপসিংহকে

পরাজিত করেছিলেন। রাজপুত রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে আকবর তাঁদের আনুগত্য লাভ করেছিলেন। তিনি নিজে অম্বর ও যোধপুরের দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। অম্বরের আর এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সলীমের বিয়ে হয়েছিল। সাধারণ হিন্দুরাও আকবরের উদার শাসনে নানা প্রকারে উপকৃত হয়েছিল। মুসলমান আমলে হিন্দুদের 'জিজিয়া' নামে একটি কর দিতে হত। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে আলাদা কর নেওয়া হত। আকবর এই দুটি কর তুলে দেন। তিনি আদেশ দেন যে হিন্দুরা বিনা বাধায় তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সকল রকম ধর্মকার্য করতে পারবে। আকবর হিন্দুদিগকে উদারতার দ্বারা বশ করেছিলেন বলেই মুঘল সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পরেও একশত বৎসরের অধিক কাল সগৌরবে বর্তমান ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে আকবরের কোনরকম গোঁড়ামি ছিল না। সকল ধর্মেই যথার্থ সত্য আছে—এই মূল সত্যটি তিনি স্বীকার করতেন। তিনি হিন্দু পন্ডিত, জৈন সন্ন্যাসী, মুসলমান মৌলবী এবং খ্রিস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করতেন। সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মের মত ব্যাখ্যা করতেন, আকবর সকলের কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। আগ্রার নিকটবর্তী ফতেপুর সিক্রীতে আকবর এক নূতন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে 'ইবাদৎখানা' নামক প্রাসাদে ধর্মালোচনায় আকবর এক নূতন মতবাদ প্রবর্তন করেন। এর নাম 'দীন ইলাহী'। এতে সকল ধর্মের সারমর্ম সংগৃহীত হয়েছিল। অনেক বড় বড় লোক 'দীন ইলাহী' গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ একে গ্রহণ না করলে আকবর কখনও বলপ্রয়োগ করতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর 'দীন ইলাহী' বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মতো আকবরের দরবারে বহু গুণী ব্যক্তি

আশ্রয়লাভ করেছিলেন। আকবরের বন্ধু আবুল ফজল অসাধারণ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি 'আকবর-নামা' এবং 'আইন-ই-আকবরী' নামক দু'খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। ফারসী ভাষায় লেখা এই বই দু'খানি পড়লে আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস এবং তাঁর শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফজলের বড় ভাই ফৈজী বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি

সম্রাট আকবর

সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে হিন্দুদের প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনা করেছিলেন। আকবরের আদেশে অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ করা হয়। আকবরের সভাসদ্ রাজা বীরবল সুরসিক ও সুকবি ছিলেন। তিনি চমৎকার হিন্দী কবিতা লিখতেন। তানসেন ছিলেন বিখ্যাত গায়ক। আবুল ফজল লিখেছেন যে তানসেনের মতো সঙ্গীতজ্ঞ

পৃথিবীতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। আকবর নিজে লেখাপড়া জানতেন না বটে, কিন্তু তিনি বিদ্বান্ ও গুণীর সমাদর করতেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ ভক্ত কবি তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' নামক হিন্দী রামায়ণ রচনা করেন।

আবুল ফজল

ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণের মধ্যে আকবর সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর চরিত্রে উদারতা, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি নানা গুণ ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টি ছিল। মুসলমান রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষ হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মাতৃভূমি, সুতরাং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই এই দেশের উন্নতি সাধিত হতে পারে। ধর্মের গোঁড়ামি মানুষকে পরস্পরের নিকট থেকে পৃথক্ করে রাখবে, এটা তিনি স্বীকার করতেন না। এই সকল কারণেই

তিনি এত বড় সাম্রাজ্য গঠন করতে এবং তার সুশাসনের ব্যবস্থা করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর গুণমুগ্ধ হিন্দু প্রজারা 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' (অর্থাৎ দিল্লির সম্রাট্ বা পৃথিবীর ঈশ্বর) বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করত।

ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ, মৈত্রী ও শান্তির দেশ—ইহাই আকবরের বাণী। এই বাণী অনুসরণ করবার প্রয়োজন তাঁর মৃত্যুর সাড়ে তিন শত বৎসর পরেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

খ্রিস্টাব্দ
- —১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ : মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন
- —১৫৫৫ হুমায়ুনের দিল্লি ও আগ্রা অধিকার
- —১৫৫৬ হুমায়ুনের মৃত্যু : আকবরের রাজ্যলাভ : পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
- —১৬০৫ আকবরের মৃত্যু

আলোচনা

১। আকবরের বাল্যজীবন কিরূপে কেটেছিল?

২। বৈরাম খাঁ কে? তিনি কিরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের সেবা করেন?

৩। আকবরের রাজ্যবিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। আকবরের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

৫। "আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা"—এই কথাটি ব্যাখ্যা কর।

৬। 'দীন ইলাহী' সম্বন্ধে কি জান?

৭। আকবরের সভার কয়েকজন গুণীর পরিচয় দাও।

রানা প্রতাপসিংহ

চিতোরের রানা সংগ্রামসিংহ বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খানুয়ায় পরাজিত হয়েছিলেন। আকবর যখন দিল্লির বাদশাহ্‌, তখন চিতোরের রানা ছিলেন সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহ। অম্বর যোধপুর (মারবাড়) প্রভৃতি রাজ্যের রাজপুত রাজগণ বিনা যুদ্ধে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ মুঘল রাজ-পরিবারে কন্যা দান করে সম্রাটের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু উদয়সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। বন্ধুভাবে
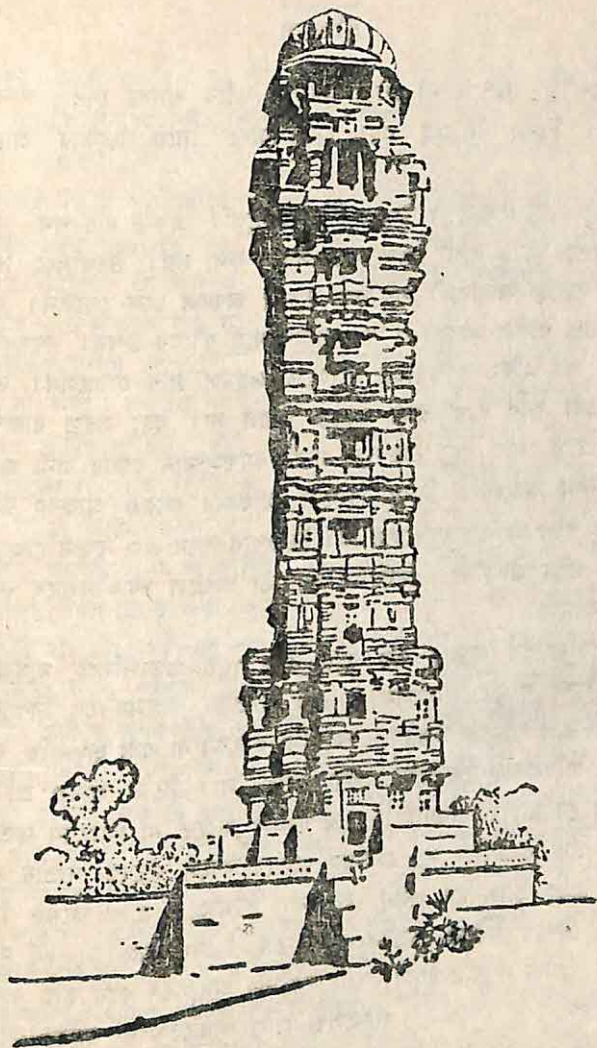
চিতোরের বিজয়স্তম্ভ

তাঁকে বশীভূত করতে না পেরে আকবর তাঁকে শাস্তি দেবার সংকল্প করলেন। তিনি নিজেই বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন।

খাড়া, উঁচু পাহাড়ের উপরে চিতোর দুর্গ। একটি মাত্র পথ। সেই পথে উপরে উঠে দুর্গ দখল করা সহজ কথা নয়। উদয়সিংহ নিজে চিতোর ছেড়ে আরাবল্লী পর্বতের দুর্গম অঞ্চলে চলে গেলেন। দুর্গ রক্ষার ভার থাকল জয়মল ও পত্তা নামক দুই বীরের উপর। কয়েকদিন যুদ্ধের পর হঠাৎ আকবরের গুলিতে জয়মল প্রাণ হারালেন। তখন রাজপুতরা আর দুর্গ রক্ষা করতে পারল না। বহু সহস্র রাজপুত বীরের প্রাণ গেল, বহু রাজপুত নারী আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জহর-ব্রত পালন করলেন। কিন্তু চিতোর অধিকার করেও আকবর উদয়-সিংহকে বশে আনতে পারলেন না। উদয়পুর নামে এক নূতন রাজধানী নির্মাণ করে উদয়সিংহ মেবারের পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে লাগলেন।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বীর পুত্র প্রতাপসিংহ মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে কিছুতেই তিনি দিল্লির সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করবেন না এবং বাদশাহি বংশে নিজের পরিবারের মেয়েদের বিয়ে দেবেন না। তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করলেন যে যতদিন তিনি চিতোর উদ্ধার করতে না পারবেন ততদিন তিনি দাড়ি কামাবেন না, সোনার থালার বদলে গাছের পাতায় রুটি খাবেন এবং তৃণশয্যায় শয়ন করবেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও তিনি চিতোর উদ্ধার করতে পারেন নাই, তাই তিনি আজীবন এই সকল প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর বংশধর উদয়পুরের রানারা ইংরেজ আমলেও দাড়ি কামাতেন না, ভোজন-পাত্রের নিচে গাছের পাতা এবং বিছানার নিচে তৃণ রাখতেন।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতাপসিংহ নানারকম কষ্ট সহ্য করেছেন। অল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে তিনি বিশাল মুঘল-বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছেন। বহুদিন তাঁকে বনে-জঙ্গলে বাস করতে হয়েছিল, দীর্ঘকাল তিনি সপরিবারে খাদ্যাভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও বীরের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। শেষে মুঘলদের হাত থেকে তিনি মেবার রাজ্যের অধিকাংশই উদ্ধার করেছিলেন, কেবলমাত্র রাজধানী চিতোর তাঁর মৃত্যুকালেও বাদশাহী অধিকারে ছিল।

রাজপুতনায় দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক লোকের একেবারে অভাব ছিল না, আবার প্রভুভক্ত স্বার্থত্যাগী বীরও সেখানে কম জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রতাপসিংহের ছোট ভাই শক্তসিংহ আকবরের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। শেষে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রতাপের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, মহানুভব রানা সস্নেহে ভাইকে বুকে টেনে নেন। একবার অর্থাভাবে যুদ্ধ চালাতে না পেরে প্রতাপসিংহ ঠিক করলেন যে রাজপুতানা ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবেন, রাজপুতানায় থেকে মুঘলের অধীনতা স্বীকার করবেন না। দেশত্যাগ করতে হলেও তিনি স্বাধীনতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখন তাঁর এক মন্ত্রী এসে নিবেদন করলেন, "মহারানা, আপনি দেশত্যাগ করবেন না। আমার পূর্বপুরুষেরা বহুদিন এই রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তা' আমি দেশের মঙ্গলের জন্য দান করব। আপনি সেই অর্থ নিয়ে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।" মন্ত্রীর এই স্বার্থত্যাগ ও প্রভুভক্তি দেখে প্রতাপ বিস্মিত হলেন। তিনি দেশত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করে আবার আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

হলদীঘাট নামক স্থানে মুঘল সৈন্যের সঙ্গে প্রতাপসিংহের ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে বাদশাহি বাহিনীর প্রধান নায়ক ছিলেন

এক রাজপুত বীর—অম্বরের মানসিংহ। মেবারের রাজপুতদের বীরত্বের তুলনা ছিল না, কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল মুঘলদের চেয়ে অনেক কম,—তাই তারা পরাজিত হল। প্রতাপ নিজে যুদ্ধে আহত হন। বাদশাহি সৈন্যের আক্রমণে একবার তাঁর প্রাণ বিপন্ন হয়েছিল। তখন তাঁর অধীন এক সর্দার নিজের প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন।

জাহাঙ্গীর

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বীরের কাহিনী আছে, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রতাপের জীবনে দেখা যায় তার তুলনা পাওয়া কঠিন।

প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহও দীর্ঘকাল মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন দিল্লির বাদশাহ ছিলেন আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর। পিতার ন্যায় সাহস ও মনের বল অমরসিংহের ছিল না।

দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে মেবারের সর্দারেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই অমরসিংহ অবশেষে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সন্ধি করলেন। মেবারের স্বাধীনতা গেল। কিন্তু স্বাধীনতার পূজারী রানা প্রতাপের কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল।

খ্রিস্টাব্দ
- —১৫৬৮ আকবর কর্তৃক চিতোর অধিকার
- —১৫৭২-৯৭ প্রতাপসিংহের রাজত্বকাল
- —১৫৭৬ হলদীঘাটের যুদ্ধ
- —১৬১৫ অমরসিংহ কর্তৃক জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার

আলোচনা

১। আকবর কিরূপে চিতোর অধিকার করেছিলেন?
২। রানা প্রতাপকে 'স্বাধীনতার পূজারী' বলা হয়েছে কেন?
৩। মেবার কখন মুঘলের অধীনতা স্বীকার করে?

বাংলার বীর

সাড়ে-সাতশত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে মুসলমান রাজত্বের গোড়াপত্তন করেছিলেন বখ্‌তিয়ার খলজি। প্রায় দেড়শত বৎসর বাংলা ছিল দিল্লির সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। সেকালে বাংলার মুসলমান শাসনকর্তারা দিল্লিতে কর পাঠাতেন, কিন্তু শাসন-কার্য সম্বন্ধে দিল্লির হুকুম গ্রাহ্য না করে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো চলতেন। মোহম্মদ বিন্ তুঘলুকের সময়েই দিল্লির সুলতানী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। বাংলা দেশও তখন স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান হুসেন শাহের কথা তোমরা পড়েছ।

হুসেন শাহের পরবর্তী বাংলার এক স্বাধীন সুলতানকে পরাজিত করে পাঠান বীর শের শাহ্ বাংলা দেশ অধিকার করেছিলেন, এবং দেশ সুশাসনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অযোগ্য বংশধরগণের আমলে বাংলা আবার দিল্লির অধীনতা থেকে মুক্ত হল। বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করে আকবর এই প্রদেশটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

কিন্তু দায়ুদ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর পরেও সমগ্র বাংলা দেশ সহজে বা অল্প সময়ের মধ্যে দিগ্বিজয়ী মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। দিল্লি থেকে বহু দূরে এই বাংলা দেশ। সেকালে রেল, স্টিমার, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ ছিল না। তাই দিল্লি থেকে সুদূর বাংলায় কর্তৃত্ব করা সহজ হত না। তারপর বাংলা নদ-নদীর দেশ, স্থলযুদ্ধে অভ্যস্ত মুঘল বাহিনী এখানে সহজে চলাফেরা করতে পারত না। সেকালে

বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের দেহে শক্তি ও মনে সাহস ছিল। তারা বাদশাহী হুকুম তামিল করার চেয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করা পছন্দ করত। এই সকল কারণে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ আকবরকে বাংলা দেশ বশে আনতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আকবর এবং তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর সমগ্র বাংলা দেশ দিল্লির অধীনতা স্বীকার করে।

মুঘল বাদশাহির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে যাঁরা বাঙালীর সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা ইতিহাসে 'বার ভুইঞা' নামে সুপরিচিত। 'ভুইঞা' শব্দের সাধারণ অর্থ জমিদার। সেকালে বাংলায় যে মাত্র বারজন জমিদার ছিলেন তা' নয়। জমিদারদের মধ্যে যাঁরা বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে বিস্তৃত ভূখন্ড দখল করে মুঘল বাদশাহি প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিলেন তাঁরাই সাধারণভাবে 'বার ভুইঞা' নামে খ্যাতিলাভ করেন। আকবরের আমলে রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বরের রাজা মানসিংহ দীর্ঘকাল বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। ভুইঞাদের দমনের ভার আকবর তাঁকেই দিয়েছিলেন।

বর্তমানে বাংলা দেশের অন্তর্গত যশোহর জেলায় ভূষণার জমিদার বা ভুইঞা ছিলেন কেদার রায়। তাঁর বীর পুত্র চাঁদ রায় মুঘল-বিরোধী আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। পরে ভূষণা দুর্গ মুঘলদের অধিকারে আসে এবং যুদ্ধে আহত হয়ে কেদার রায় পূর্বদিকে পলায়ন করেন। সেখানে ঈশা খাঁ নামক একজন ভুইঞার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং তিনি বাহুবলে ঢাকা জেলার দক্ষিণ অংশে নিজের অধিকার স্থাপন করেন। শ্রীপুরে তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর আরাকানী মগ জলদস্যুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেদার রায় মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। রণক্ষেত্রে আহত হয়ে তিন বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় মানসিংহের সম্মুখে

আনবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। কেদার রায়ের মৃত্যুর ফলে ঢাকা অঞ্চলে মুঘল-প্রভুত্ব স্থাপনের প্রধান বাধা দূর হল।

বার ভুইঞার মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন:

যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥

প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর বিশ্বাসভাজন কর্মচারী ছিলেন। দায়ুদ খাঁর পতনের পর তিনি বহু ধনরত্ন নিয়ে বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার দক্ষিণ অংশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলে বহু নদী ও বিস্তৃত জঙ্গল ছিল। বিজয়ী মুঘলেরা ঐ দুর্গম স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না মনে করে শ্রীহরি সেখানে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করলেন। মুঘলের ভয়ে ভীত হয়ে বহু লোক ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করল। শ্রীহরি তখন 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে তাদের উপর রাজত্ব করতে লাগলেন। দক্ষিণ বঙ্গের জঙ্গলাবৃত জলাভূমিতে এক নূতন রাজ্য গড়ে উঠল।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর এই রাজ্যের অধিপতি হলেন তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য। তাঁর বাহুবলে ও সুশাসনে বর্তমান যশোহর, খুলনা ও বরিশাল জেলার অধিকাংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ততদিনে বাংলার প্রায় সকল জমিদারই মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেছেন। আকবরের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে ইসলাম খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন। ইসলাম খাঁর দৃষ্টি পড়ল

খুলনার জঙ্গলে লুকানো প্রতাপের সমৃদ্ধ রাজ্যের উপর। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মুঘলের বিরোধ আরম্ভ হল।

প্রবল মুঘল শক্তির সঙ্গে বিরোধিতা করা কঠিন দেখে প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর সঙ্গে সাময়িক সন্ধি স্থাপন করলেন। কিন্তু শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হল না। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য দখল করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। ছয় হাজার সৈন্য এবং তিনশত রণতরী প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হল। প্রতাপের জামাতা ছিলেন বর্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাকলা অঞ্চলের পরাক্রান্ত জমিদার বা ভুইঞা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র। জামাতা যাতে শ্বশুরকে সাহায্য করতে না পারেন সেজন্য বাকলাতেও বাদশাহি ফৌজ প্রেরিত হল। এদিকে প্রতাপাদিত্যও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি বহু সৈন্য ও রণতরী সংগ্রহ করলেন। ফিরিঙ্গি (পর্তুগীজ) এবং পাঠান সেনানায়কদের সাহায্যে তিনি যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।

বর্তমান চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বনগাঁও শহরের দশ মাইল দক্ষিণে সালকা নামক স্থানে বাদশাহি ফৌজের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের যুদ্ধ হল। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও উদয়াদিত্য জয়ী হতে পারলেন না। তাঁর রণতরীগুলি ধ্বংস হল, তিনি পলায়ন করে পিতার রাজধানী ধুমঘাটে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর মিলনস্থলে ধুমঘাট অবস্থিত। বাকলার রামচন্দ্রও বাদশাহি ফৌজের কাছে পরাজিত হলেন। তাঁকে বন্দী করে ঢাকায় রাখা হল। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী, মুঘল সুবাদারের বাসস্থান।

চারিদিকে সর্বনাশের কালো ছায়া দেখেও প্রতাপাদিত্য আত্মবিশ্বাস হারালেন না। বাদশাহি ফৌজের সঙ্গে তাঁর আবার যুদ্ধ হল। এবারও পরাজিত হয়ে তিনি মুঘলদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু ইসলাম খাঁ বীরত্বের মর্যাদা দিলেন না। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য কেড়ে

নেওয়া হল, তিনি ও তাঁর পুত্রেরা বন্দী হলেন। প্রবাদ আছে যে ঢাকায় এক লোহার খাঁচায় কিছুদিন আটক রেখে তাঁকে দিল্লিতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পথে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য প্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গি (পর্তুগীজ) বীর কার্ভালোকে হত্যা করেছিলেন। কার্ভালো কিছুকাল কেদার রায়ের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। বর্তমান বাংলা দেশে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ নামক দ্বীপটি তিনি অধিকার করেছিলেন। এই দ্বীপের অধিকার নিয়ে মুঘল, আরাকানী, মগ এবং পর্তুগীজদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছিল। সম্ভবত আরাকানের রাজাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই প্রতাপাদিত্য মগদের শত্রু কার্ভালোর প্রাণনাশ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঈশা খাঁ নামক একজন মুসলমান ভুইঞার কীর্তি-কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপাধি ছিল 'মসনদ-ই-আলা'। বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কোন কোন অংশ তাঁর অধিকার-ভুক্ত হয়েছিল। বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী খিজিরপুর, সাতগাঁও এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত এগারসিন্দুর তাঁর সামরিক কেন্দ্র ছিল। নদ-নদী-প্লাবিত এই দুর্গম অঞ্চলে থেকে তিনি বারবার বাদশাহি ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

শেষ জীবনে ঈশা খাঁ মানসিংহের আক্রমণে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খাঁ কিছুকাল মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। তখন তাঁর রাজ্য কেড়ে নেওয়া হয়।

দীর্ঘকাল প্রবল মুঘল শক্তির আক্রমণ সহ্য করবার ক্ষমতা বাংলার ভুইঞাদের ছিল না। হয়তো ভুইঞাদের শাসনের পরিবর্তে মুঘল-শাসন প্রতিষ্ঠা বাংলার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল। মুঘল-শাসন বাংলায় ঐক্যস্থাপন করেছিল। তবু ভুইঞাদের বীরত্ব-কাহিনী বাঙালীর মন

থেকে মুছে যায় নাই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের কঠোর সংগ্রাম তাঁদের নাম স্মরণীয় করে রেখেছে।

খ্রিস্টাব্দ
—১৫৫৬-১৬০৫ আকবরের রাজত্বকাল
—১৫৭৫-৭৬ দায়ুদ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু
—১৫৯৪-১৬০৬ বাংলায় মানসিংহের শাসনকাল
—১৫৯৩ চাঁদ রায়ের মৃত্যু
—১৫৯৯ ঈশা খাঁর মৃত্যু
—১৬০৩ কেদার রায়ের মৃত্যু
—১৬০৫-২৭ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল
—১৬০৮-১৩ বাংলায় ইসলাম খাঁর শাসনকাল
—১৬১১ মুসা খাঁর পরাজয়
—১৬১২ প্রতাপাদিত্যের পতন

আলোচনা

১। 'ভুইঞা' শব্দের অর্থ কি? 'বার ভুইঞা' কাদের বলা হত?

২। কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এবং ঈশা খাঁ সম্বন্ধে কি জান? তাঁরা বাংলার যে অংশে প্রভুত্ব করতেন তার একটি মানচিত্র আঁকতে পার কি?

৩। বাঙালী এখনও বার ভুইঞার বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করে কেন?

শাহজাহান

সম্রাট্ আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহাঙ্গীর। তাঁর আমলে বাংলা দেশে মুঘল আধিপত্য

শাহজাহান

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মেবার দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেছিল। আকবরের মতো সাহসী ও বুদ্ধিমান্ না হলেও জাহাঙ্গীর প্রজাদের সুখ-সুবিধার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র খুরম বা শাহজাহান সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল।

সেকালে সকল রাজাই নিজের রাজ্য বিস্তার করবার চেষ্টা করতেন। শাহজাহান নিজে বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের সময়ে নানা যুদ্ধে রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। সিংহাসন লাভ করেই তিনি দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলি অধিকার করবার আয়োজন করলেন।

আকবর বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানার সঙ্গে যুদ্ধ করে আহম্মদনগর রাজ্যের রাজধানী অধিকার করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে ঐ রাজ্যের একটি অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু শাহজাহান দখল করেন। আহম্মদনগরের স্বাধীন রাজবংশ বিলুপ্ত হল।

দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামে আরও দুইটি মুসলমান-রাজ্য ছিল। ঐ দুই রাজ্যের সুলতানগণ শাহজাহানের কাছে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন, তাঁদের রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল না। দাক্ষিণাত্যের মুঘল-শাসিত অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব।

শাহজাহানের রাজত্বের শতাধিক বৎসর আগে পর্তুগীজেরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিল। পর্তুগীজ জলদস্যুরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। তাদের নির্মম অত্যাচারে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের কোন কোন অংশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। আরাকানের দুর্দান্ত মগেরা পর্তুগীজ লুণ্ঠনকারীদের সঙ্গে যোগ দিত। 'মগের মুল্লুক' কথাটির মধ্যে সেকালের ভয়াবহ স্মৃতি বেঁচে রয়েছে।

পর্তুগীজদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য শাহজাহান বাংলার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুঘল সৈন্যদল পর্তুগীজদের প্রধান কেন্দ্র হুগলী অধিকার করল এবং বহু পর্তুগীজকে বন্দী করে দিল্লিতে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল।
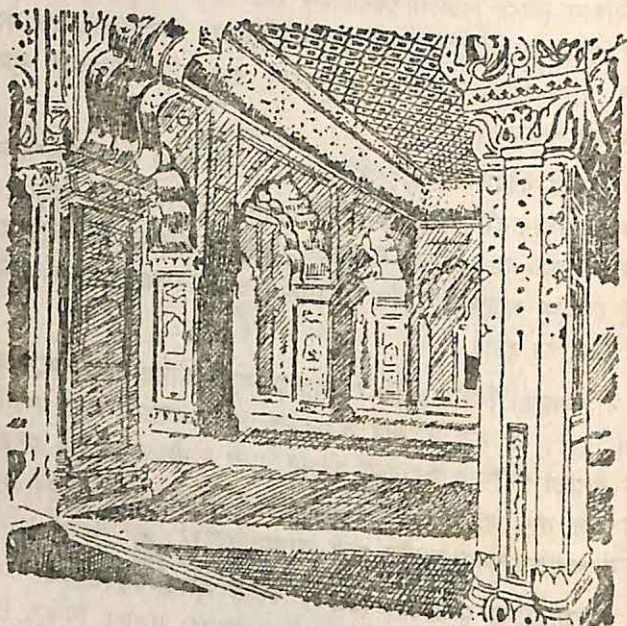
দেওয়ান-ই-আম

আফগানিস্তানের অন্তর্গত কান্দাহার শহরের অধিকার নিয়ে বহুদিন যাবৎ পারস্যের শাহদের সঙ্গে দিল্লির মুঘল বাদশাহদের

বিরোধ চলছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে পারস্যের একজন রাজ-কর্মচারী কান্দাহার মুঘলদের হস্তে সমর্পণ করেন। কয়েক বৎসর পরে পারস্যের শাহ্ কান্দাহার অধিকার করেন। শাহজাহান তিনবার কান্দাহার আক্রমণ করেও পারস্যের সৈন্যদলকে বিতাড়িত করতে পারলেন না। মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বল্খ্ ও বদক্শান জয় করার জন্য শাহজাহানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

শাহজাহান জাঁকজমক ও আড়ম্বর খুব ভালবাসতেন। তিনি রাজ-কোষে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে নূতন নূতন কারুকার্যে শোভিত প্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এই দিক্ থেকে বিচার করলে তাঁর কীর্তির তুলনা নেই।

শাহজাহান দিল্লিতে যমুনার তীরে শাহজাহানাবাদ নামক এক নূতন শহর নির্মাণ করেন। আকবরের আমলে নির্মিত আগ্রার প্রসাদ-দুর্গেও তিনি বহু নূতন অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। দিল্লির জুম্মা মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস এবং আগ্রার মোতি মসজিদ সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এগুলি শাহজাহানের স্মরণীয় কীর্তি।

শাহজাহান প্রায় ছয় কোটি টাকা খরচ করে ময়ূর সিংহাসন নামে প্রসিদ্ধ এক অপূর্ব আসন নির্মাণ করেছিলেন। এমন বিচিত্র সিংহাসন পৃথিবীতে আর ছিল না। এর চারিটি পা ছিল সোনার তৈরী, বারটি মণিমাণিক্যখচিত স্তম্ভের উপর মনোহর চন্দ্রাতপ বিস্তৃত ছিল, প্রত্যেকটি স্তম্ভে ছিল উজ্জ্বল রত্নখচিত দুইটি ময়ূরের মূর্তি। ময়ূরগুলির ফাঁকে ফাঁকে ছিল মণিমাণিক্যখচিত বৃক্ষ। শাহজাহানের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে পারস্যের রাজা নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং দিল্লি লুণ্ঠন করে ময়ূর সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান।

শাহজাহানের শিরস্ত্রাণে কোহিনূর নামক অপূর্ব মণি শোভা পেত। ময়ূর সিংহাসনের সঙ্গে এই মণিও লুণ্ঠন করেছিলেন নাদির শাহ্।

পত্নী মমতাজমহলের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য শাহজাহান প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন। প্রায় বিশ হাজার লোক বাইশ বৎসর পরিশ্রম করে তাজমহল নির্মাণ করেছিল।

তাজমহল উৎকৃষ্ট মার্বেল পাথরে নির্মিত, দেয়ালে বিচিত্র কারুকার্য। দেশবিদেশের শিল্পীরা একত্রিত হয়ে তাজমহল নির্মাণ করেছিল। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ শহরের অধিবাসী ওস্তাদ ঈশা তাজমহলের নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় তাজমহলের বর্ণনা করেছেন:

এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

শাহজাহানের শেষজীবন বড়ই কষ্টে কেটেছিল। তাঁর চার পুত্র ছিলেন—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। বৃদ্ধবয়সে শাহজাহান একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনায় তাঁর পুত্রদের মধ্যে প্রত্যেকেরই সিংহাসন লাভের লোভ হল। ভাইদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সর্বাপেক্ষা সুচতুর ও রণনিপুণ ছিলেন। তিনি দারা, সুজা ও মুরাদকে পরাজিত করলেন। দারা ও মুরাদকে তাঁর আদেশে হত্যা করা হল। সুজা ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে মগদের হাতে প্রাণ হারালেন। আওরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসন অধিকার করে 'আলমগীর' (ভুবনবিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করলেন। শাহজাহান আগ্রার প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটালেন। শেষ জীবনে তাঁর আদরের মেয়ে জাহানারা তাঁর সেবা যত্ন করেছিলেন।

দীর্ঘকাল পরে ঘটনাচক্রে কোহিনূর মহারানী ভিক্টোরিয়ার হস্তগত হয়েছিল।

তাজমহল

শাহজাহানের সর্বপ্রধান কীর্তি আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত তাজমহল। এমন সুন্দর সমাধিমন্দির পৃথিবীতে আর নাই। প্রিয়তমা

খ্রিস্টাব্দ	—১৪৯৮	পর্তুগীজদের ভারতে আগমন
	—১৬০৫-১৬২৭	জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল
	—১৬২৭-১৬৫৮	শাহজাহানের রাজত্বকাল
	—১৭৩৯	নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

আলোচনা

১। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার বর্ণনা কর।

২। শাহজাহানের সৌন্দর্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে কি জান?

৩। যদি দিল্লি ও আগ্রা দেখে থাক তবে মুঘল আমলের প্রাসাদদুর্গ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

আওরঙ্গজেব

শাহজাহান জীবিত থাকাতেই আওরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন।

আওরঙ্গজেব

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে আওরঙ্গজেব একজন। তাঁর অনেক গুণ ছিল। তিনি অসাধারণ সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী ছিলেন। সাম্রাজ্য-শাসক রূপে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। তিনি সেকালের অন্যান্য রাজাদের মতো বিলাসী ছিলেন না। তিনি

অনেকটা ফকিরের মতো সরল ও সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। তিনি বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিজেই করতেন, কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতেন না। অবসর সময়ে তিনি কোরান নকল এবং টুপি সেলাই করতেন। কোরান ও টুপি বিক্রয় করে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই সামান্য অর্থেই তাঁর সমাধির ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছিল। ইসলাম ধর্মে তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। এই ধর্মের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য তিনি বাদশাহি দরবারে গানবাজনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। তাঁর লেখা চিঠিপত্র পড়লে আরবী ও ফারসী ভাষায় এবং সাহিত্যে তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু এত গুণ থাকতেও আওরঙ্গজেবকে আদর্শ সম্রাট রূপে গণ্য করা যায় না। কোন কোন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল সঙ্কীর্ণ। মোটের উপর তাঁর চরিত্রে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তিনি কা'কেও বিশ্বাস করতেন না। নিজের ছেলেদের অধীনেও তিনি বেশী সৈন্য রাখতেন না, তারা কখন বিদ্রোহী হয় এই ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত থাকতেন। এই জন্যই শাসনসংক্রান্ত সকল কাজ তিনি নিজে দেখতেন। কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের সকল কাজ একজন লোকের পক্ষে তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব ছিল। তাঁর ব্যবহারে বড় বড় রাজকর্মচারিগণ ও সেনাপতিগণ তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের চরিত্রের সব চেয়ে বড় ত্রুটি ছিল ধর্ম বিষয়ে উদারতার অভাব। আকবর যে উদার নীতির ফলে হিন্দুদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন, আওরঙ্গজেব তা' অনুসরণ না করে শাসন-কার্যে বিপরীত নীতি অনুসরণ করেছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস করে আকবর পেয়েছিলেন তাদের বিশ্বাস এবং সহযোগিতা, আর হিন্দুদের অবিশ্বাস করে আওরঙ্গজেব পেয়েছিলেন তাদের সন্দেহ ও শত্রুতা।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য আয়তনে ও খ্যাতিতে উন্নতির চরম সীমায় উঠেছিল; কিন্তু তাঁর ভ্রান্ত এবং অনুদার নীতির জন্য তাঁর শেষ জীবনেই এই বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয়েছিল।

সিংহাসন লাভের অল্পদিন পরেই আওরঙ্গজেব তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর জুমলাকে কোচবিহার ও আসাম জয় করতে প্রেরণ

রাজসিংহ। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও আওরঙ্গজেব রাজপুত বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ্ অজিত-সিংহকে যোধপুরের রাজা বলে স্বীকার করলেন। তখন রাজপুতদের সঙ্গে মুঘলদের সন্ধি হল।

আওরঙ্গজেবের সময়ে কেবল যে রাজপুতরাই বিদ্রোহী হয়েছিল তা' নয়, শিবাজীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতিও স্বাধীন হয়েছিল। ক্রমাগত বহু বৎসর কাল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও আওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রে মুঘলশাসন পুনঃস্থাপন করতে পারলেন না। পঞ্জাবের শিখগুরু তেগ বাহাদুর আওরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন। তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দসিংহ শিখ সম্প্রদায়কে নূতন ভাবে ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মথুরায় জাঠেরা বিদ্রোহী হল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি প্রভৃতি কয়েকটি দুর্দান্ত পার্বত্য জাতিও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। দীর্ঘকাল বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুঘল বাহিনীর শক্তিক্ষয় হল। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা কালে বৃদ্ধবয়সে আওরঙ্গ-জেবের মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেবের শেষ জীবনে মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হল। তাঁর বংশধরেরা ছিলেন দুর্বল, এতবড় সাম্রাজ্য রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। সম্রাট্‌দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হতে লাগলেন। মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধি হল। পারস্যের রাজা নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। তিনি দিল্লি অধিকার করে বহু সহস্র লোককে হত্যা করলেন। তারপর শাহজাহানের মহামূল্য ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর মণি এবং প্রচুর ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে তিনি পারস্যে ফিরে গেলেন। কিছুদিন পরে কাবুলের অধিপতি আহম্মদ শাহ্ আবদালি

করেন। মীর জুমলা পথে বহু কষ্ট সহ্য করে আসামে উপস্থিত হন এবং আসামের অহোম রাজাকে দিল্লির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। আসামের রাজধানী গড়গাঁও এবং গৌহাটি শহর মুঘলদের হস্তগত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই অহোম রাজা গৌহাটি ও গড়গাঁও আবার অধিকার করেন। আসামে মুঘল অধিকার স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু মীর জুমলার আক্রমণে কোচবিহারের রাজা বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন।

মীর জুমলার পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার হন। তিনি আরাকানের মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। আকবরের বাংলা আক্রমণের প্রায় শতবর্ষ পরে বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে মুঘল অধিকার স্থাপিত হয়।

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামক মুসলমান-রাজ্য দুইটি অধিকার করেছিলেন। তাঁর আমলে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক প্রসার লাভ করে।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মেবার ও যোধপুর (বা মারবাড়) রাজ্যের রাজপুতেরা মুঘল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। রাজপুতেরা আকবরের সময়ে নানা প্রকারে মুঘল সাম্রাজ্যের সাহায্য করেছিল। ধর্মের জন্য এবং অন্যান্য কারণে তাদের সন্দেহ উৎপাদন করে আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিলেন। যোধপুরের রাজা যশোবন্তসিংহ অকালে মারা যান। তখন তাঁর শিশুপুত্র অজিত-সিংহকে সিংহাসন না দিয়ে আওরঙ্গজেব যোধপুর রাজ্য অধিকার করেন। রাজপুতেরা এই অন্যায় ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে। মুঘল-বিরোধী রাজপুতদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন নাবালক অজিত-সিংহের অভিভাবক রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস এবং মেবারের রানা মহাবীর

শিবাজী

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মহারাষ্ট্র দেশ। এই দেশ পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে হায়দরাবাদ এবং উত্তর-পূর্বে নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের মহারাষ্ট্রীয় বা মারাঠা বলে। মারাঠারা বীরের জাতি। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুলতানরা মারাঠা সর্দারদের বড় বড় রাজকার্যে নিযুক্ত করতেন। তাঁদের বড় বড় জায়গির দেওয়া হত। যুদ্ধের সময় সুলতানেরা তাঁদের কাছে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতেন।

শাহাজী নামক এক মারাঠা সর্দার প্রথমে আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে, পরে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে জায়গিরদার ছিলেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল শিবাজী। পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের নামক পার্বত্য দুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়েছিল। তাঁর মায়ের নাম ছিল জিজাবাঈ। শাহাজী বিজাপুরের রাজকার্য উপলক্ষে সুদূর কর্ণাটকে বাস করতেন, তাই তিনি দাদাজী কোন্ডদেব নামক এক বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে শিবাজীর অভিভাবক ও শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তখনকার দিনে যুদ্ধই মারাঠাদের প্রধান বৃত্তি বা কাজ বলে গণ্য হত, লেখাপড়ার তেমন আদর বা মর্যাদা ছিল না। তাই শিবাজী পড়াশুনার দিকে মন দিলেন না। শিকার, অশ্বারোহণ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল কাজে সাহস ও শক্তির দরকার হয় তাতে শিবাজীর খুব আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনতে শুনতে তাঁর মনে সেই যুগের বীরদের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরবলাভের ইচ্ছা জাগল।

পঞ্জাব অধিকার করলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ও গৌরব নিঃশেষিত হয়ে গেল।

যদি আওরঙ্গজেব দূরদর্শী আকবরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হিন্দুদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করতেন তবে হয়তো মুঘল সাম্রাজ্য আরো বহুদিন স্থায়ী হত। তাঁর সময়ে রাজপুত, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি সাহসী ও যুদ্ধ নিপুণ জাতির মনে অসন্তোষ সৃষ্টি না হলে মুঘল সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ভেঙে পড়ত না। কিন্তু আওরঙ্গজেবের অনুদারতা এবং তাঁর বংশধরদের অযোগ্যতা ছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আরো কারণ ছিল। সেকালে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল না, সংবাদ দেওয়া-নেওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল। দিল্লি বা আগ্রা থেকে এতবড় সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা দুঃসাধ্য ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন তার পতনের অন্যতম কারণ।

খ্রিস্টাব্দ		
	—১৬৫৮-১৭০৭	আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল
	—১৭৩৯	নাদির শাহের রাজত্বকাল
	—১৮৫৮	শেষ মুঘল সম্রাট্ বাহাদুর শাহের পদচ্যুতি

আলোচনা

১। আওরঙ্গজেবের চরিত্রে কি কি গুণ ও দোষ ছিল? তাঁকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করা যায় কি?

২। আওরঙ্গজেবের রাজ্যবিস্তার বর্ণনা কর।

৩। আওরঙ্গজেব এবং আকবরের মধ্যে তুলনা করলে কাকে তোমাদের বড় বলে মনে হয়?

শিবাজী

মহারাষ্ট্র দেশে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন শিবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হল।

কিন্তু বিজাপুরের অধীন একজন জায়গিরদারের ছেলের পক্ষে একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা সহজ কথা নয়। শিবাজী ধীরভাবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর নায়কত্বে মাওলিজাতীয় কৃষকেরা নিপুণ যোদ্ধায় পরিণত হল। কয়েকজন দুঃসাহসী সহকর্মী সংগ্রহ করে তিনি এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করলেন এবং চারিদিকে নগর ও গ্রাম লুণ্ঠন করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে বিজাপুরের সুলতানের অধীন কয়েকটি দুর্গ তিনি দখল করলেন। তখনও শাহাজী বিজাপুরের সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। সুলতান পুত্রের অপরাধে পিতাকে বন্দী করলেন। শিবাজীর চেষ্টার ফলে সুলতান কিছুদিন পারে শাহাজীকে মুক্ত করে দিলেন।

এদিকে শিবাজীর সাহস ও ক্ষমতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। তখন বিজাপুরের সুলতান স্থির করলেন যে, তাঁকে আর তুচ্ছ করা যায় না। শিবাজীকে দমন করবার জন্য তিনি আফজল খাঁ নামক এক প্রবীণ সেনা-পতির অধীনে বহু সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করলেন। শিবাজী সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিলেন। আফজল খাঁ অনেক চেষ্টা করেও শিবাজীকে সে দুর্গ থেকে বাইরে আনতে পারলেন না। তখন তিনি সন্ধির প্রস্তাব করলেন, শিবাজীও সম্মত হলেন। আফজল খাঁর সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাৎ হল। সাক্ষাৎকালে শিবাজীর অস্ত্রের আঘাতে আফজল খাঁ প্রাণ হারালেন। শিবাজী পূর্বেই সংবাদ পেয়েছিলেন যে তাঁকে কৌশলে হত্যা করাই আফজল খাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য আফজল খাঁকে হত্যা করেছিলেন। সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুর পর বিজাপুরের সৈন্যদল শিবাজীকে দমন করতে পারল না।

বিজাপুরের সুলতানের আক্রমণ ব্যর্থ করে শিবাজীর সাহস বেড়ে গেল। তিনি দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকারভুক্ত স্থানগুলি লুণ্ঠন করতে লাগলেন। তখন শায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনকর্তা। আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করবার জন্য তাঁকে জরুরী নির্দেশ দিলেন। শায়েস্তা খাঁ পুণা এবং কল্যাণ অধিকার করলেন। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে শিবাজী শায়েস্তা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করলেন। মুঘল সৈন্যদল আকস্মিক আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শায়েস্তা খাঁ আহত হয়ে পলায়ন করলেন। পুণা শিবাজীর হস্তগত হল।

কিছুদিন পরে শিবাজী পশ্চিম ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করলেন। তখন আওরঙ্গজেব সেনাপতি দিলীর খাঁ এবং অম্বরের রাজা জয়সিংহকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠালেন। জয়সিংহ শিবাজীকে পরাজিত করে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। শিবাজী মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করলেন এবং কয়েকটি দুর্গ মুঘলদের হাতে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করলেন। তখন শিবাজী তাঁকে সাহায্য করলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পর শিবাজী জয়সিংহের অনুরোধে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আগ্রায় গেলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র শম্ভাজী, কিন্তু বাদশাহ দরবারে শিবাজীকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হল না; তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন। তখন সম্রাটের আদেশে তাঁর বাড়ির চারদিকে প্রহরী মোতায়েন করা হল। শিবাজী দেখলেন যে তিনি বন্দী হয়েছেন। তখন মুক্তিলাভের জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন। অসুখের ভান করে তিনি কয়েকদিন চুপচাপ থাকলেন। তারপর অসুখ আরোগ্য হয়েছে ঘোষণা করে তিনি আগ্রার বড় বড় লোকদের বাড়িতে ঝুড়ি

ঝুড়ি উপহার পাঠাতে লাগলেন। প্রথম কয়েকদিন প্রহরীরা ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করত; পরে সন্দেহ না হওয়ায় তারা আর পরীক্ষা করত না। একদিন শিবাজী নিজে এক ঝুড়িতে বসলেন এবং আর এক ঝুড়িতে তাঁর ছেলেকে বসালেন। বাহকেরা ঝুড়ি নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল। তখন শিবাজী ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে গোপনে দাক্ষিণাত্যে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

কিছুকাল পরে শিবাজী মুঘলদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। মুঘলদের কয়েকটি দুর্গ তাঁর হস্তগত হল। তিনি আবার সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করলেন। অবশেষে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। রায়গড় তাঁর রাজধানী হল। তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করলেন। ছয় বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার পর মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কর্ণাটকের কিয়দংশ এবং মহীশূরের অধিকাংশ জয় করেছিলেন।

শিবাজী যে কেবল যুদ্ধই করতেন তা' নয়; তিনি তাঁর রাজ্যের সুশাসনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থাও করেছিলেন। শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আটজন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা 'অষ্টপ্রধান' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য রাজ্যটি কয়েকটি 'প্রান্ত' বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। উৎপন্ন শস্যের দুই-পঞ্চমাংশ রাজকর রূপে নেওয়া হত। শিবাজী 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' নামে আরো দু'প্রকারের কর আদায় করতেন। 'চৌথ' অর্থ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ, আর সরদেশমুখী অর্থ রাজস্বের এক-দশমাংশ। এই কর মারাঠা-রাজ্যের বাইরে মুঘল শাসনাধীন অঞ্চল থেকে আদায় করা হত।

শিবাজী কঠোরভাবে সৈন্যদলে শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। তিনি কয়েকটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল

দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে অশ্বারোহীরা সরকারী তহবিল থেকে বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক পেত তাদের 'বারগীর' বলা হত। বাংলায় পরে তাদের বলা হত 'বর্গী'। যারা নিজ নিজ বাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক নিয়ে যুদ্ধ করত তাদের বলা হত 'শিলাদার'। জলযুদ্ধের জন্য শিবাজী নৌবহর নির্মাণ করেছিলেন।

শিবাজী সাহসী, বুদ্ধিমান্ এবং ধর্মভীরু ছিলেন। সাধারণ জায়গিরদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তিনি বিজাপুরের সুলতান এবং দিল্লির বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই সাফল্যেই তাঁর অসীম সাহস ও রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সৈন্যদের কখনও বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করতে দিতেন না। ধর্মমন্দির ও ধর্মগ্রন্থের অবমাননা তিনি কখনও করেন নাই। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সারাজীবন যুদ্ধ করেছেন বটে, কিন্তু কখনও তাদের ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান নাই। মসজিদের খরচ চালাবার জন্য তিনি নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। শিবাজীর বিরোধী মুসলমান লেখকেরাও তাঁর মহৎ চরিত্র এবং উদারতার প্রশংসা করেছেন।

শিবাজী মারাঠা জাতিকে নূতন উৎসাহে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও মারাঠারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করত। তাঁর পুত্র শম্ভাজী আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হন। কিন্তু আওরঙ্গজেব দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও মারাঠা জাতিকে বশে আনতে পারেন নাই।

শম্ভাজীর পুত্র শাহুর রাজত্বকালে 'পেশোয়া' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। ক্রমে তাঁরাই মারাঠা-রাজ্যের প্রকৃত প্রভু হলেন। পেশোয়াদের আমলে এক বিরাট্ মারাঠা-সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের ক্রমান্বয়ে তিনটি যুদ্ধ ঘটে এবং মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতন হয়।

খ্রিস্টাব্দ	—১৬৫৮-১৭০৭	আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল
	—১৬৩০	শিবাজীর জন্ম
	—১৬৮০	শিবাজীর মৃত্যু
	—১৮১৮	মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতন: ইংরেজ কর্তৃক পেশোয়াদের রাজ্য অধিকার

আলোচনা

১। শিবাজীর জীবন-কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা কর।

২। শিবাজীর শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কি জান?

৩। শিবাজীর সঙ্গে আওরঙ্গজেবের তুলনা করলে কাকে তোমাদের বড় বলে মনে হয়?

প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। ব্যাবসায়ীদের অবস্থাও খুব সমৃদ্ধ ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে পশ্চিম ভারতের সুরাট বন্দরে বহু ধনবান্ ভারতীয় বণিক্ বাস করতেন। তাঁদের ধন সম্পদের লোভেই শিবাজী দু'বার সুরাট লুণ্ঠন করেছিলেন।

আমীর-ওমরাহ্, বণিক্ এবং মধ্যবিত্ত প্রজাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল বটে, কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের অবস্থা মোটের উপর খারাপ ছিল বলেই মনে হয়। রাজকর্মচারীরা প্রায়ই গরিব কৃষক এবং মজুর-মিস্ত্রীদের উপর অত্যাচার করত। গরিব লোকদের অনেক সময় দু'বেলা আহার জুটত না। দেশে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তখন গরিবেরা খাদ্য সংগ্রহের জন্য ছেলেমেয়ে পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হত। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য দুর্ভিক্ষের সময় তাড়াতাড়ি এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় খাদ্যদ্রব্য চালান দেওয়ার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হত না, তবে প্রজাদের কষ্ট লাঘবের জন্য শস্য না জন্মিলে রাজস্ব মকুব করা হত। শাহজাহানের রাজত্বকালে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যায়। শহরের লোকদের অবস্থা পল্লীগ্রামের লোকদের অবস্থার তুলনায় ভাল ছিল বলে মনে হয়। তবে পল্লীগ্রামের লোকেরা খাদ্য সম্বন্ধে অনেকটা স্বাবলম্বী ছিল, এবং তাদের অভাববোধ কম ছিল।

ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ে বাংলা দেশের অর্থসম্পদের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বাংলা থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে ধান ও চিনি রপ্তানি হত। বাংলার রেশমী ও সুতী বস্ত্র তখন জগদ্বিখ্যাত ছিল। বার্নিয়ে বলেছেন, কেউ বাংলায় এলে আর বাংলা ছেড়ে যেতে চাইত না। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে—চট্টগ্রামবিজয়ী শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা তখন—টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হত বলে প্রবাদ আছে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের সকল প্রদেশের অবস্থাই এত সমৃদ্ধ ছিল না।

মুঘল যুগে ভারত

মুঘল সম্রাট্‌দের শাসনকালে বিদেশ থেকে অনেক পর্যটক ভারতে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ে ও তেভার্নিয়ে, ওলন্দাজ বণিক্ ফ্রান্‌সিস্কো পেল্‌সার্ট, ইংরেজ ধর্মযাজক টেরি এবং ইংলন্ডের রাজদূত স্যার টমাস রো—এই কয়েকজনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এঁদের লেখা বিবরণী থেকে আমরা ভারতের সে-সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানতে পারি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে বৈদেশিক পর্যটকেরা সাধারণত সম্রাটের দরবার এবং সাম্রাজ্যের বড় বড় লোকদের কথাই লিখেছেন। দেশের সাধারণ লোকের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী আমাদের বিস্তৃতভাবে জানবার বিশেষ কোন উপায় নেই।

প্রাচীনকাল থেকেই বিদেশে ভারতের ঐশ্বর্যের কথা প্রচারিত ছিল। ভারতের ঐশ্বর্যে লুব্ধ হয়েই ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। মুঘল আমলে ভারতের সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছিল। মুঘল আমলের শেষদিকে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে পারস্যরাজ নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন।

বিদেশী লেখকদের বিবরণে দেখা যায়, সম্রাট্ ও সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহ্‌গণ কল্পনাতীত বিলাসিতার মধ্যে বাস করতেন। ভোজ এবং উৎসবাদিতে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হত। সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীতে বিপুল উৎসব হত। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অনুকরণে মুঘল সম্রাটেরা জন্মদিনে নিজেদের ওজনে সোনা প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্য

এখন সুদূর পল্লীগ্রামেও সকলে সরকারের শাসন মেনে চলে; কিন্তু মুঘল আমলে কেবল বড় বড় শহরে বাদশাহি শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্থানীয় রাজকর্মচারীরা অনেক সময় গরিবদের উপর অত্যাচার করতেন। তবে যুদ্ধের সময় সৈন্যদল কৃষকদের চাষের ক্ষতি করলে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হত। পল্লীর শাসনভার জমিদার এবং পল্লীবাসীদের উপরই ন্যস্ত ছিল।

মুঘল যুগে ভারতে নানাবিধ শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। শিল্প বিভাগে সুশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হত। সেকালে লাহোরের শাল, ফতেপুর সিক্রির গালিচা, গুজরাটের কার্পাস বস্ত্র এবং ঢাকার মসলিন সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

মুঘল যুগে সম্রাট্ এবং আমীর-ওমরাহ্‌গণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি-ভবন, ফতেপুর সিক্রিতে আকবর কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদ, আগ্রায় জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত ইতিমদ্দৌলার সমাধি, আগ্রায় ও দিল্লিতে শাহজাহানের নির্মিত প্রাসাদসমূহ মুগল যুগের স্মরণীয় কীর্তি। মুঘল সম্রাটেরা স্থাপত্য শিল্পের ন্যায় চিত্রশিল্পেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময়ে এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়।

মুঘল আমলে সাহিত্য এবং বিদ্যাচর্চারও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আকবর নিজে নিরক্ষর হয়েও বিদ্যার অনুরাগী এবং পণ্ডিতদের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। ফৈজী, আবুল ফজল প্রভৃতির নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ফারসী ভাষায় লেখা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ফারসী

ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি তুলসীদাস ছিলেন আকবরের সমসাময়িক। তাঁর লেখা 'রামচরিতমানস' কাব্যে রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙালী কবি কাশীরাম দাস এই যুগে 'মহাভারত' রচনা করেন।

আলোচনা

১। মুঘল যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল? সেকালের পল্লীজীবন সম্বন্ধে কি জান?

২। মুঘল আমলে শিল্প ও সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?

ভারতে ইউরোপীয় বণিক্

অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য চলত। দুই হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে তৈয়ারী নানারকম জিনিস সুদূর রোম সাম্রাজ্যে বিক্রয় হত। ভারতে উৎপন্ন মসলা, বস্ত্র প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের ইউরোপে খুব আদর ছিল। এক সময় আরব দেশের মুসলমান বণিকেরা এই সকল জিনিস ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে চালান দিত। সাড়ে-চারশত বৎসর আগে ইউরোপীয় বণিকেরা সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করতে উৎসুক হল। দিল্লিতে তখন সুলতানী আমল চলেছে, বাবর তখনও ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন নাই।

ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসবার জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বাস স্পেন দেশ থেকে সমুদ্রযাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে তিনি আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে এক নূতন মহাদেশে উপস্থিত হন। আমেরিকা আবিষ্কারক রূপে তাঁর কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করলেন ভাস্কো-দা-গামা নামে পর্তুগালের এক নাবিক। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। এখন ইউরোপ থেকে জাহাজ ভারতবর্ষে আসে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে, কিন্তু ভাস্কো-দা-গামার সময় সুয়েজ খালের অস্তিত্বই ছিল না।

ভাস্কো-দা-গামা নূতন পথের সন্ধান দেবার পর পর্তুগীজ বণিকেরা

ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হল। নানাস্থানে পর্তুগীজ বাণিজ্য-কুঠি প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলায় পর্তুগীজদের প্রধান কেন্দ্র ছিল হুগলী। সম্রাট্ শাহজাহানের আদেশে হুগলীর পর্তুগীজ কুঠি ধ্বংস করা হয়েছিল। যশোহর, খুলনা, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পর্তুগীজেরা লুটপাট এবং নানারকম অত্যাচার করত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন আলবুকার্ক নামক এক শাসনকর্তা। এক সময়ে বোম্বাই পর্তুগীজদের অধীন ছিল। গোয়া, দমন এবং দিউ কয়েক বৎসর আগে পর্তুগালের অধীন ছিল।

ভাস্কো-দা-গামার শতবর্ষ পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকেরাও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করে। তখন এদেশে মুঘল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ এবং ওলন্দাজগণ (হল্যান্ডের অধিবাসী) এদেশে উপস্থিত হয় আকবরের রাজত্বের শেষভাগে। ফরাসীরা এল আওরঙ্গজেবের আমলে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার জন্য কয়েকজন ইংরেজ বণিক্‌কে সনদ দিয়েছিলেন ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথ। এই বণিকেরা সম্মিলিত হয়ে 'ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করেছিল। দেড়শত বৎসর পরে এই কোম্পানি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে।

এলিজাবেথের পরে ইংলন্ডের রাজা হয়েছিলেন প্রথম জেম্‌স্। তিনি ভারতে ইংরেজ বণিক্‌দের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে এক দূত পাঠিয়েছিলেন। এই দূতের নাম ছিল স্যার টমাস রো। তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর শহরে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এদেশের যে বিবরণ লিখেছেন তা' পড়লে জাহাঙ্গীরের সময়ের অনেক কথা জানা যায়।

সম্রাট্ শাহজাহানের সময়ে মাদ্রাজে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইংরেজ বণিকেরা পর্তুগীজদের নিকট থেকে বোম্বাই দ্বীপের অধিকার লাভ করে। পশ্চিম ভারতে তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সুরাট। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে জব চার্নক বর্তমান কলকাতা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। এখানে ইংরেজেরা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। তখন ইংলন্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। তাঁর নাম অনুসারে কলকাতা দুর্গের নাম হল 'ফোর্ট উইলিয়ম'। হুগলী, কাসিমবাজার (বহরমপুরের নিকটবর্তী), ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলায় এবং দক্ষিণ ভারতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফরাসী বণিকেরা। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মাদ্রাজের দক্ষিণে পণ্ডিচেরী নামক স্থানে এবং বাংলার অন্তর্গত চন্দননগরে ফরাসী বণিকেরা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। ভারত স্বাধীন হবার পর পণ্ডিচেরীতে ও চন্দননগরে ফরাসী-শাসন বিলুপ্ত হয়েছে।

যতদিন মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ও গৌরব ক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন ইউরোপীয় বণিকেরা বাণিজ্য করেই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে লাগল, তখন এদের মনে রাজ্যের লোভ জাগল। ভারতবর্ষ তখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, রাজায়-নবাবে লড়াই চলছে। সকলেই চায় নিজের সুবিধা, দেশের স্বার্থ কেউ দেখে না। সেই দুর্দিনে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করল। নানাকারণে ফরাসীরা যুদ্ধে পরাজিত হল—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হল।

ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি প্রধান কারণ

ছিল বাংলা দেশে বাণিজ্য করার অধিকার। সেকালে বাংলা দেশ কেবল যে কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল তা' নয়, বাংলায় শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বিশেষত বয়ন শিল্পে বাঙালীর কৃতিত্ব অতুলনীয় ছিল। ঢাকায় তৈয়ারী মস্‌লিনের মতো সূক্ষ্ম বস্ত্র অন্য কোন দেশে প্রস্তুত হত না। বাংলা দেশ থেকে কার্পাস এবং রেশম বোনা কাপড় প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হত। ইংলন্ডের জনসাধারণ ভারতীয় বস্ত্র এত পছন্দ করত যে, ইংলন্ডে তৈয়ারী বস্ত্রের চাহিদা কমে গেল। ইংলন্ডের বস্ত্রব্যাবসায়ীরা বিপন্ন হল। তখন ইংলন্ডে আইনের সাহায্যে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা হল। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার উৎপন্ন বস্ত্র কিনে ইংলন্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে চালান দিত।

ইংরেজ বণিকেরা বুঝেছিল যে বাংলার শাসনভার হাতে পেলে তাদের বাণিজ্যের সুবিধা হবে, তখন তারা বাংলার বয়ন শিল্প ধ্বংস করে বাঙালীর কাছে বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের সুযোগ পাবে। ফরাসীরা পরাজিত হল, বাংলার নবাব হলেন কোম্পানির হাতের পুতুল। তখন ইংরেজ বণিকের সেই সুযোগ এল। বাংলায় ইংরেজ-শাসন স্থাপনের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই বাংলার বয়ন শিল্প ইংরেজের অত্যাচারে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁতীরা বাধ্য হয়ে নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলল, তাদের মস্‌লিন তৈয়ারি করবার সামর্থ্য থাকল না। ঢাকাই মস্‌লিন বিলাতে যাবার পরিবর্তে বিলাতের কলে তৈয়ারী মিহি কাপড় বাংলা দেশে আসতে লাগল। ম্যান্‌চেস্টারের কাপড়ে বাংলার বাজার ছেয়ে গেল। পরাধীন বাঙালী ইংরেজ শাসকের নূতন ব্যবস্থায় দেশী কাপড় ফেলে বিদেশী কাপড় পরতে শিখল।

খ্রিস্টাব্দ
—১৪৯৮ ভাস্কো-দা-গামার কালিকটে আগমন
—১৫২৬ বাবর কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন
—১৫৫৬-১৬০৫ আকবরের রাজত্বকাল
—১৬০০ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন
—১৬০৫-২৭ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল
—১৬১৫-১৮ স্যার টমাস রো'র দৌত্য
—১৬২৭-৫৮ শাহজাহানের রাজত্বকাল
—১৬৩৯ মাদ্রাজে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠিস্থাপন
—১৬৫৮-১৭০৭ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল
—১৬৬১ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোম্বাই লাভ
—১৬৬৪ ফরাসীদের ভারতে বাণিজ্যের সূত্রপাত
—১৬৯০ জব চার্নক কর্তৃক কলকাতা স্থাপন
—১৭৫৭ বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্বের সূত্রপাত

আলোচনা

১। ইউরোপীয় বণিকেরা কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল?

২। ভারতে পর্তুগীজ বণিকদের সম্বন্ধে কি জান?

৩। ভাস্কো-দা-গামা, আলবুকার্ক, স্যার টমাস রো—এঁদের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কেন?

৪। ইংরেজ বণিকেরা কিভাবে ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করেছিল?

৫। বাংলার বয়ন শিল্প কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল?

সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাসিম

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির মুঘল বাদশাহ্‌দের ক্ষমতা কমে গেল। সেই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন হয়ে বসলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ নামে আওরঙ্গজেবের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। নামে মুঘল সম্রাটের অধীন হলেও কার্যত তিনি দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন। পূর্বে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা। মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বাংলায় নবাবী আমলের আরম্ভ মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে, আর অবসান পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে বাংলার নবাবী অধিকার করেন আলিবর্দী খাঁ। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজের বয়স ছিল কম, শাসনকার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা মোটেই ছিল না। অথচ তখন তাঁর ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। আলিবর্দী খাঁর কন্যা ঘসেটি বেগম এবং দৌহিত্র পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গ সিরাজকে সিংহাসন থেকে সরাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নবাবী দরবারের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই নূতন নবাবের বিরুদ্ধে ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সেনাপতি মীরজাফর, ধনকুবের জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি। প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার করে সিরাজ তাদেরও সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল বাইরের শত্রু ইংরেজ।

তখন দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা আর শুধু বাণিজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না,

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। বাংলায় ইংরেজদের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতায়, আর ফরাসীদের কুঠি ছিল কলকাতার কাছাকাছি চন্দননগরে। ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইংরেজরা কলকাতার দুর্গ মেরামত করল, এ সম্বন্ধে নবাবের নিষেধ তারা গ্রাহ্য করল না। বে-আইনী বাণিজ্য করে তারা নবাবের রাজস্বের ক্ষতি করতে লাগল। তারা নবাবের অবাধ্য কর্মচারী রাজা রাজবল্লভের পুত্রকে কলকাতায় আশ্রয় দিল।

সিরাজউদ্দৌলা

ইংরেজদের দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে সিরাজ আকস্মিক আক্রমণে কলকাতা অধিকার করলেন। তখন মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় এসে নবাবী ফৌজকে তাড়িয়ে দিয়ে কলকাতা

দখল করলেন। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হল। কিন্তু চতুর ক্লাইভ দেখলেন যে সিরাজ যতদিন নবাব থাকবেন ততদিন ইংরেজদের নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হবে। তিনি মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। স্থির হল যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে নবাবী দিতে হবে।

ক্লাইভ

ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হলে ক্লাইভ তিন হাজার সৈন্য নিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। নবাবের সৈন্য-সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের বেশী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত পলাশী গ্রামে যুদ্ধ হল। নবাবের সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল প্রাণপণে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের আদেশে

তাঁর অধীন সৈন্যেরা যুদ্ধে যোগ না দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।
নবাবের প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের জয় হল। ইংরেজ
পক্ষে মাত্র ১৮ জন নিহত এবং ৫৬ জন আহত হল। মীরজাফর নবাবের
সর্বনাশ না করলে বাংলা বিদেশীর হাতে পড়ত না।

পলাশীতে পরাজয়ের পর সিরাজ ফিরে গেলেন রাজধানী
মুর্শিদাবাদে। সেখানে বিপদের সম্ভাবনা দেখে তিনি বিহারের দিকে
যাত্রা করলেন। পথে এক বিশ্বাসঘাতক মুসলমান ফকিরের ষড়যন্ত্রে
তিনি ধরা পড়লেন। মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে তাঁকে নিষ্ঠুর-
ভাবে হত্যা করা হল। বাংলার স্বাধীনতা সিরাজের রক্তস্রোতে ডুবে
গেল।

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব হলেন মীরজাফর, কিন্তু আসল
কর্তৃত্ব গেল ইংরেজের হাতে। মীরজাফর ছিলেন অকর্মণ্য, দেশ শাসন
করবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ইংরেজদের তিনি অনেক টাকা দেবার
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু অত টাকা রাজকোষে ছিল না। ইংরেজরা
বিরক্ত হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাসিমকে নবাবী দিল।

ইংরেজদের অনুগ্রহে নবাবী লাভ করে মীরকাসিম কোম্পানিকে
সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাংলার তিনটি জেলার (বর্ধমান,
মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম) জমিদারী স্বত্ব প্রদান করলেন। কিন্তু তিনি
স্বাধীনচেতা ও কর্মদক্ষ পুরুষ ছিলেন, শাসনকার্যে ও বাণিজ্য সম্বন্ধে
ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কোম্পানির
কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল বে-আইনী সুবিধা ভোগ
করত তাতে বাধা দিয়ে মীরকাসিম তাদের বিরাগভাজন হলেন।
ইংরেজদের শক্তিকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে থাকবার জন্য তিনি বিহারের
অন্তর্গত মুঙ্গেরে নূতন রাজধানী স্থাপন করলেন। নিজের সামরিক

শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি ইউরোপীয় প্রথায় নবাবী সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করলেন। মীরকাসিমের এই সকল ব্যবস্থায় ইংরেজদের সন্দেহ বেড়ে গেল। তারা হঠাৎ পাটনা শহর দখল করার চেষ্টা করে প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা করল।

মীরকাসিম সম্মুখ সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারলেন না। পর পর কাটোয়া, ঘেরিয়া এবং উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি নিজের রাজ্য ছেড়ে পশ্চিমদিকে চলে গেলেন। এই দুর্দিনে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লির মুঘল সম্রাট্ শাহ্ আলম। অবশ্য শাহ্ আলমের তখন কোন ক্ষমতা ছিল না, তিনি ছিলেন অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিম ও সুজাউদ্দৌলার মিলিত বাহিনীও ইংরেজদের কাছে পরাজিত হল। সুজাউদ্দৌলা ও শাহ্ আলম কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি করলেন। মীরকাসিম পথের ভিখারী হয়ে কয়েক বৎসর পরে প্রাণত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজদের অনুগ্রহে মীরজাফর আবার মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু নবাবের আর কোন ক্ষমতা ছিল না, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই বাংলার প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মীরকাসিম বাংলার স্বাধীন নবাবী রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছিলেন।

খিৃস্টাব্দ		
	—১৭২৭	মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু
	—১৭৪০-৫৬	আলিবর্দী খাঁর শাসনকাল
	—১৭৫৬-৫৭	সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল
	—১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন)
	—১৭৬০-৬৩	মীরকাসিমের শাসনকাল
	—১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ

আলোচনা

১। বাংলার 'নবাবী আমল' কোন্ সময়কে বলা হয়?

২। কিরূপে সিরাজের পতন ঘটল? এর জন্য মীরজাফর কতখানি দায়ী?

৩। ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাসিমের যুদ্ধ হল কেন?

৪। পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান?

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—ওআরেন হেস্টিংস

পলাশীর যুদ্ধের পরে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান। কিন্তু বাংলা দেশে নানারকম গোলযোগের কথা শুনে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে আবার বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে এদেশে পাঠিয়ে দেন। এবার তিনি দিল্লির বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট থেকে কোম্পানির নামে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানির সনদ (অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার) গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি বাংলা দেশ শাসনের নূতন ব্যবস্থা করে আবার ইংলন্ডে ফিরে গেলেন।

কিন্তু বাংলা দেশে শান্তি স্থাপিত হল না। নবাবের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাঁর কর্মচারীরা ইংরেজদের আশ্রয়ে থেকে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। কিন্তু ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও দেশ শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করল না। অনাবৃষ্টি ও কুশাসনের ফলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে) এই দুর্ভিক্ষ ঘটে-ছিল। নিদারুণ খাদ্যাভাবে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে একজন ইংরেজ কর্মচারী লিখেছিলেন যে মৃতদেহের স্তূপ রাজপথ ঢেকে রেখেছে এবং লোকে ক্ষুধার জ্বালায় মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে বড়লাট লর্ড

কর্নওআলিস বলেছিলেন যে, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে বন্য জন্তু বাস করছে।

বাংলার এই ভীষণ দুর্দিনে কোম্পানির কর্মচারীরা লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই, বরঞ্চ তাদের মধ্যে অনেকে নানা

ওআরেন হেস্টিংস্

কৌশলে চড়া দামে চাউল বিক্রয় করে লাভবান্ হয়েছিল। মুঘল আমলে দুর্ভিক্ষ হলে সরকারী খাজনা মকুব করা হত। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা মন্বন্তরের বৎসর আগের চেয়েও বেশী খাজনা আদায় করেছিল। সরকারী অত্যাচারে জনসাধারণের দুর্দশা বেড়ে গেল।

বাংলার দুরবস্থার সংবাদ পেয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ওআরেন হেস্টিংসকে বাংলার শাসনকর্তা বা 'গভর্নর' নিযুক্ত করলেন। পরে ইংলন্ডের পার্লামেন্টের এক আইন অনুসারে হেস্টিংস 'গভর্নর-জেনারেল' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল বাংলার শাসন-কর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়েই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কোম্পানির কর্তৃপক্ষের আদেশে হেস্টিংস শাসনকার্যের নূতন বন্দোবস্ত করেছিলেন। নবাবের ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হল। তিনি ইংরেজের বৃত্তিভোগী হলেন। কোম্পানি শাসনকার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করল। মুর্শিদাবাদের বদলে কলকাতা শাসনকার্যের কেন্দ্র হল। প্রতি জেলায় ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হল। গুরুতর মকদ্দমার বিচারের জন্য কলকাতায় তিনটি প্রধান আদালত স্থাপিত হল। মুর্শিদাবাদের পতন এবং কলকাতার উন্নতি আরম্ভ হল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ-শাসন কায়েম হল।

কিন্তু কেবলমাত্র শাসনকার্যেই হেস্টিংসের মনোযোগ আবদ্ধ ছিল না। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা বক্সারের যুদ্ধের পর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুগত মিত্র হয়েছিলেন। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তখন রোহিলা আফগান সর্দারেরা রাজত্ব করতেন। সুজাউদ্দৌলা রাজ্যলাভে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে হেস্টিংস কোম্পানির সৈন্য দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে হেস্টিংস নবাবের নিকট থেকে কোম্পানির জন্য প্রচুর অর্থ আদায় করেন। কোম্পানির সাহায্যে বলীয়ান হয়ে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের রাজ্য অধিকার করলেন।

হেস্টিংসের সময়ে মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ হয়েছিল।

তখন বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধান নায়ক ছিলেন পেশোয়া। পুণায় পেশোয়াদের রাজধানী ছিল। পেশোয়া পরিবারের মধ্যে কলহের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা পশ্চিম ভারতে কয়েকটি স্থান দখল করেছিল। এর ফলে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তা' আট বৎসর চলেছিল। এই যুদ্ধে নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শক্তিপরীক্ষা হল। মারাঠারা তখনও শক্তিশালী ছিল, তাই যুদ্ধের ফলে কোম্পানি বিশেষ লাভবান্ হল না। মারাঠা যুদ্ধের শেষদিকে হেস্টিংস মহীশূরের অধিপতি হায়দর আলির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন।

হেস্টিংস এদেশে কতকগুলি অন্যায় কাজ করেছিলেন। মহারাজা নন্দকুমার নামক একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী তাঁর বিরুদ্ধে নবাব মীরজাফরের পত্নীর নিকট থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন। কিছুদিন পরে জালিয়াতির অভিযোগে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হয়। সম্ভবত হেস্টিংসের বিরোধিতা করার জন্যই তাঁর এই চরম দণ্ড হয়েছিল। অযোধ্যার নবাব পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের উৎপীড়ন করে হেস্টিংস প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থলাভের জন্য তিনি বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহকে পদচ্যুত করেন। এই সকল কারণে হেস্টিংস স্বদেশে ফিরে গেলে পার্লামেন্টে তাঁর বিচার হয়েছিল। বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করেছিলেন, কিন্তু বিচার উপলক্ষে দীর্ঘকাল তাঁকে মানসিক উদ্বেগ ও অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

হেস্টিংস বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা-দানের জন্য তিনি কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর সময়ে মনীষী স্যার উইলিয়ম জোন্স্ কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করেন।

খ্রিস্টাব্দ

—১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ
—১৭৬৫	কোম্পানির দেওয়ানি লাভ
—১৭৭০	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
—১৭৭২-৮৫	ওআরেন হেস্টিংসের শাসনকাল
—১৭৭৪	রোহিলা যুদ্ধ
—১৭৭৫	নন্দকুমারের ফাঁসি
—১৭৭৫-৮২	প্রথম মারাঠা যুদ্ধ
—১৭৮০-৮৪	দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ

আলোচনা

১। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধে কি জান?

২। হেস্টিংস ক্লাইভের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন কেন?

৩। হেস্টিংস কি কি অন্যায় কাজ করেছিলেন? এজন্য তাঁর কোন শাস্তি হয়েছিল কি?

৪। হেস্টিংসের কাহিনী পড়ে তাঁর চরিত্রে কি কি গুণ ছিল বলে তোমাদের মনে হয়?

হায়দর আলি ও টিপু সুলতান

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মহীশূর নামে দক্ষিণ ভারতে একটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য ছিল। পলাশীর যুদ্ধের চার বৎসর পরে হায়দর আলি

হায়দর আলি

নামক এক অসমসাহসী ও বুদ্ধিমান্ মুসলমান সৈনিক ঐ রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। তিনি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতান

মহীশূর রাজ্যের আয়তন, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু শেষে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে মহীশূরের গৌরব ধ্বংস হয়ে যায়।

হায়দর আলি প্রথম জীবনে সাধারণ সৈনিক ছিলেন। বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে তিনি ক্রমশ উন্নতি লাভ করেন। তাঁর চারদিকে পরাক্রান্ত শত্রুর অভাব ছিল না। ইংরেজরা কোনদিনই তাঁকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে নাই। হায়দরাবাদের নিজাম ও আর্কটের নবাব সুযোগ পেলেই

টিপু সুলতান

তাঁর অনিষ্ট করতেন। মারাঠাদের সঙ্গে হায়দরকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তখন মারাঠাদের প্রবল প্রতাপ। পুণার পেশোয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এই সকল শত্রুর

প্রবল বাধা সত্ত্বেও হায়দর নূতন রাজ্যখণ্ড অধিকার করে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইংরেজদের সঙ্গে হায়দরের দুবার যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথমবার যুদ্ধের সময় তিনি সসৈন্যে মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের সময় বড়লাট ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বেই হায়দরের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র টিপু কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে সন্ধি করেন। এই দুটি যুদ্ধে ইংরেজদের কোন লাভ হয় নাই।

লর্ড কর্নওআলিস যখন বড়লাট তখন টিপুর সঙ্গে ইংরেজদের আবার যুদ্ধ হয়। পেশোয়া এবং নিজাম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধের পর টিপু পরাজিত হয়ে সন্ধি করলেন। মহীশূর রাজ্যের অর্ধাংশ কোম্পানি এবং নিজামের মধ্যে ভাগাভাগি করা হল।

লর্ড কর্নওআলিসের পর বড়লাট হন লর্ড ওয়েলেসলি। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের অস্তিত্ব তাঁর সহ্য হল না। তিনি টিপুকে কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করার জন্য আহবান করলেন। টিপু এই উদ্ধত দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন ইংরেজ বাহিনী মহীশূর আক্রমণ করল। টিপু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মহীশূর রাজ্য ইংরেজদের হাতে এল। মহীশূরের এক অংশ কোম্পানির রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হল, এক অংশ কোম্পানির মিত্র নিজামকে দেওয়া হল, বাকীটা পূর্বের হিন্দু-রাজবংশের এক উত্তরাধিকারীর অধীনে রাখা হল। সেকালের ভারতীয় রাজাদের মধ্যে একমাত্র টিপু সুলতানই আগাগোড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

খ্রিস্টাব্দ
—১৭৬১-৮২ হায়দর আলির রাজত্বকাল
—১৭৬৭-৬৯ ইংরেজদের সঙ্গে হায়দরের প্রথম যুদ্ধ
—১৭৮০-৮৪ ইংরেজদের সঙ্গে হায়দর ও টিপুর দ্বিতীয় যুদ্ধ (ওআরেন হেস্টিংসের রাজত্বকাল)
—১৭৮২-৯৯ টিপু সুলতানের রাজত্বকাল
—১৭৯০-৯২ ইংরেজদের সঙ্গে টিপুর যুদ্ধ (লর্ড কর্নওআলিসের শাসনকাল)
—১৭৯৯ ইংরেজদের সঙ্গে টিপুর শেষ যুদ্ধ : টিপুর মৃত্যু : মহীশূরের স্বাধীনতা লোপ

আলোচনা

১। হায়দর আলির প্রধান শত্রু কারা ছিল?

২। টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের কাহিনী সংক্ষেপে বল। কিরূপে মহীশূরের স্বাধীনতা নষ্ট হয়?

রণজিৎ সিংহ

দিল্লির সুলতানী আমলের শেষের দিকে গুরু নানক শিখ ধর্ম প্রবর্তন করেন। 'শিখ' শব্দের অর্থ শিষ্য। শিখেরা বীরের জাতি। ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা কখনও প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। গুরু অর্জুন সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হয়েছিলেন।

রণজিৎ সিংহ

আওরঙ্গজেব গুরু তেগ বাহাদুরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে নূতন আদর্শে দীক্ষিত করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শিখেরা দীর্ঘকাল মুঘল ও আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ

করেছিল। কাবুলের প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি আহম্মদ শাহ্ আবদালি
বার বার পঞ্জাব আক্রমণ করেও নির্ভীক শিখদের বশীভূত করতে পারেন
নাই। শেষে শিখদিগকে ঐক্যবদ্ধ করে এক প্রবল শক্তিতে পরিণত
করেন রণজিৎ সিংহ। অসামান্য সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি ইতিহাসে
'পঞ্জাব-কেশরী' নামে অমর হয়ে রয়েছেন।

রণজিৎ সিংহ এক শিখ সর্দারের পুত্র ছিলেন। তাঁর বয়স যখন
মাত্র দশ বৎসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। অতি অল্প বয়সেই এক
ক্ষুদ্র রাজ্যখন্ড শাসনের ভার তাঁর উপর পড়ল। আকবর এবং শিবাজীর
মতো তিনিও লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু নিজের বাহু-
বলে ও বুদ্ধিকৌশলে তিনি একটি বৃহৎ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন
করেছিলেন।

রণজিৎ যখন পৈতৃক রাজ্যখন্ডের অধিকারী হন তখন শিখদের মধ্যে
ঐক্য ছিল না। কয়েকজন শিখ সর্দার পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন-
ভাবে রাজত্ব করতেন। রণজিৎ সিংহ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করে
শিখদের মধ্যে একতা স্থাপন করলেন। কিন্তু ইংরেজরা বাধা দেওয়ায়
তিনি শতদ্রু নদী অতিক্রম করে পূর্ব পঞ্জাবে রাজ্যবিস্তার করতে
পারেন নাই।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও কাশ্মীর তখন আফগানদের
অধীন ছিল। রণজিৎ সিংহ দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ঐ দুটি
অঞ্চল অধিকার করেন। সীমান্তের দুর্দান্ত পার্বত্য জাতিগুলিও তাঁর
শাসন মেনে নিয়েছিল।

রণজিৎ সিংহ অল্প বয়সে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে কোম্পানির
মিত্র রূপে গণ্য হয়েছিলেন। তিনি কখনও কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরেজরাও তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল।
কিন্তু তাঁর বংশধরগণ ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করতে পারেন,

নাই। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যেই ইংরেজরা শিখ-রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল।

খ্রিস্টাব্দ
—১৭৮০ রণজিৎ সিংহের জন্ম
—১৭৯০ রণজিৎ সিংহের পিতার মৃত্যু
—১৮০৯ রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরেজদের সন্ধি
—১৮৩৯ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু
—১৮৪৯ ইংরেজ কর্তৃক শিখ-রাজ্য অধিকার

আলোচনা

১। রণজিৎ সিংহকে 'পঞ্জাব-কেশরী' বলা হয় কেন?
২। শিখ জাতির ইতিহাসে রণজিৎ সিংহের নাম স্মরণীয় কেন?

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

পঞ্জাবের শিখ-রাজ্যে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপন করেছিলেন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী। লর্ড ওয়েলেস্লির মতো তিনিও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশ জয় করে কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যে কেবল যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য অধিকার করতেন তা নয়। অযোধ্যার নবাবের কুশাসনের অজুহাতে তিনি তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম কোম্পানির প্রাপ্য টাকা দিতে না পারায় তিনি নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশ দখল করেন। সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তখন লর্ড ডালহৌসী ঐ সকল রাজ্য অধিকার করেন। রাজাদের পোষ্যপুত্রদের রাজ্য পাবার অধিকার তিনি অস্বীকার করেন। শেষ পেশোয়া বাজীরাওকে যুদ্ধে পরাজিত করে কোম্পানি তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল এবং তাঁকে ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্যপুত্র নানা সাহেবকে লর্ড ডালহৌসী এই বৃত্তি দিলেন না।

এভাবে দেশীয় রাজাদের রাজ্য অধিকার করে লর্ড ডালহৌসী সমগ্র ভারতে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন। যে সকল রাজার রাজ্য তখনও যায় নাই তাঁরাও রাজ্য হারাবার হয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। যে

সকল রাজ্য ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল সেখানকার জমিদার, রাজকর্মচারী, সৈন্য-সামন্ত নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হল। অযোধ্যায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হল। নানা সাহেবের বৃত্তি-লোপে মারাঠারা অসন্তুষ্ট হল। লর্ড ডালহৌসী দিল্লির মুঘল বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে দিল্লি থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মুসলমানেরা এতে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

সেকালে কোম্পানির সৈন্যদলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীর সংখ্যাই বেশী ছিল, ইংরেজের সংখ্যা ছিল কম। নানা কারণে সিপাহীদের মনে ধারণা জন্মেছিল যে ইংরেজরা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম নষ্ট করে ভারতে খৃস্ট ধর্ম প্রবর্তন করবে। ধর্মনাশের ভয়ে কোম্পানির প্রতি সিপাহীদের ঘোর বিদ্বেষের সঞ্চার হল। এই সময় কোম্পানির সৈন্যদলের কর্তৃপক্ষ এক রকম নূতন বন্দুক ব্যবহারের হুকুম জারি করলেন। এই বন্দুক ব্যবহারের সময় পশু-চর্বিতে প্রস্তুত টোটা দাঁতে কাটতে হত। সিপাহীরা মনে করল যে তাদের ধর্ম নষ্ট করার জন্যই এই নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন তারা প্রকাশ্যে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল।

এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় কলকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরে এবং বহরমপুরে। পরে উত্তর ভারতে কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, দিল্লি, আম্বালা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কানপুরে নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে প্রচার করেন এবং বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দিল্লিতে সিপাহীরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করে। মধ্য ভারতে বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপি এবং ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ।

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহী সিপাহীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজের প্রবল শক্তির কাছে তারা পরাজিত হল। তাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। তাদের সংগঠন দুর্বল ছিল। ইংরেজদের মতো কামান-বন্দুক তাদের ছিল না। বীর নারী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। তাঁতিয়া তোপিকে বন্দী করে ইংরেজেরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পলায়ন করেন। বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হল। মুঘল বাদশাহির শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হল।

বিজয়ী ইংরেজরা এই ঘটনার নাম দিয়েছিল 'সিপাহী বিদ্রোহ'। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থানকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায়। সিপাহীদের সংগ্রাম যদি সফল হত তবে ভারতে ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটত। উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সিপাহীদের সঙ্গে জনসাধারণও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ক্যানিং। তিনি কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, কিন্তু তিনি সিপাহীদের আচরণের জন্য নিরীহ জনসাধারণকে নির্বিচারে শাস্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এজন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজরা তাঁকে ঠাট্টা করে দয়ালু ক্যানিং বলত।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে কোম্পানির রাজত্বের অবসান হল, ইংলন্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। ভারতের রাজগণের এবং জনসাধারণের মন থেকে অসন্তোষ দূর করবার জন্য তাঁর নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করা হল। এতে বলা হল যে অন্যায়ভাবে কোন দেশীয় রাজ্য অধিকার করা হবে না, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম-

বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হবে না এবং যোগ্যতা থাকলে ভারতবাসীরা বড় বড় সরকারী চাকরি পাবে।

খ্রিস্টাব্দ
- —১৮৪৮-৫৬ লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল
- —১৮৫৬-৬২ লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকাল
- —১৮৫৭ 'সিপাহী বিদ্রোহ'
- —১৮৫৮ ইংলন্ডের রানীর স্বহস্তে ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ ও ঘোষণাপত্র প্রচার

আলোচনা

১। লর্ড ডালহৌসী কিরূপে কোম্পানির রাজ্যবিস্তার করেন?
২। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কি?
৩। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কেন?
৪। সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় কেন?
৫। রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে কি বলা হয়েছিল?

স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন

সিপাহীরা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভারত স্বাধীন করতে পারেনি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বিনাযুদ্ধে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে। এই শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছেন কংগ্রেস।

সিপাহী যুদ্ধের পূর্বেই বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দেশের কৃতী সন্তানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাংলা দেশে এই নূতন যুগের প্রবর্তন করেন রামমোহন রায়। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

যে বৎসর সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয় সেই বৎসরই কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে দেশের সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হতে থাকে; নানা স্থানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা জেগে উঠল। ইংরেজরা একেবারে ভারত ছেড়ে যাবে এমন আশা সেকালে কারও মনে হয়তো ছিল না। কিন্তু ভারতবাসীরা ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে, এটাই ছিল তখনকার নেতৃবৃন্দের দাবি।

এই দাবি ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করবার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের আটাশ বৎসর পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের

প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীদের সমর্থনে কংগ্রেস ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল; কিন্তু ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের দাবি অগ্রাহ্য করতে লাগল। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের বিরোধিতার সূত্রপাত হয়। কংগ্রেসের সভাপতির আসন থেকে দাদাভাই নৌরোজী ঘোষণা করলেন যে ভারতবাসীকে 'স্বরাজ' দিতে হবে।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের বড়লাট। তখন বাংলা দেশ ছিল কংগ্রেসের কেন্দ্র। বাঙালীরা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী। তাই লর্ড কার্জন বাঙালী জাতিকে দুর্বল করবার উদ্দেশ্যে বাংলা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করলেন।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা নিয়ে নূতন বাংলা প্রদেশ গঠিত হল, আর একটি নূতন প্রদেশ হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম। বাঙালীরা এই অন্যায় ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করল। বঙ্গবিভাগ রদ করবার জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকেই এই জাতীয় সংগঠনের অনতম প্রধান নায়ক ছিলেন। বিপিনচন্দ্রও বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সর্বভারতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেন। অরবিন্দ ঘোষও এই সময়ে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে তিনি রাজনীতি ত্যাগ করে ধর্মসাধনায় রত হয়েছিলেন।

ইংরেজ সরকারকে ভারতের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'স্বদেশী আন্দোলন' আরম্ভ হয়েছিল। বাংলা দেশ এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। ইংরেজ বণিকেরা ভারতে মাল বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করত। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার নানা উপায়ে ভারতের শিল্প বিনষ্ট করেছিল। সেই সকল শিল্প পুনরায় বাঁচিয়ে তোলা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের শিল্প বেঁচে উঠলে ভারতে বিলাতী মালের চাহিদা কমে যাবে, ইংরেজ বণিকদের ক্ষতি হবে। এদিকে ভারতের জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজন মিটানর জন্য নিজেদের উপর নির্ভর করতে শিখবে, দেশের টাকা আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বিদেশে চলে যাবে না। তাই বাঙালী কবি গান রচনা করেছিলেন ঃ

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশীয় শিল্পের কিছু উন্নতি হয়েছিল। এদিকে বঙ্গ বিভাগ রদের দাবি এত প্রবল হয়ে উঠল যে, ইংরেজ সরকার লর্ড কার্জনের ব্যবস্থা বাতিল করতে বাধ্য হল। পূর্ব

ও পশ্চিম বংগ সম্মিলিত হল, আসাম পৃথক্ হল, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি ভিন্ন প্রদেশ গঠিত হল। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে নেওয়া হল। এতে কলকাতার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে গেল।

অরবিন্দ ঘোষ

বঙ্গ বিভাগ রদ হল বটে, কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য দাবি মেনে নিতে ইংরেজ সরকার মোটেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের ঘোর বিপদ-কালে ভারতবর্ষ নানা প্রকারে ইংরেজের সাহায্য করল, কিন্তু প্রতিদানে তার স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বীকার করা হল না। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হল, কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অতি

সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হল। তখন স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দু-মুসলমান মিলিত হল, নূতন সংগ্রাম শুরু হল।

এই সংগ্রামের নায়ক হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ভারতবাসীকে নূতন রাজনীতি শিক্ষা দিলেন; মানুষকে ভালবাসা দ্বারা

মহাত্মা গান্ধী

জয় করতে হবে, পরম শত্রুকেও হিংসা করা চলবে না, শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজের দাবি প্রচার করতে হবে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সাধনা করতে হবে। এতদিন মানুষের ধারণা ছিল যে পরাধীন জাতি কেবল যুদ্ধ ও রক্তপাত দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। গান্ধীজী শিক্ষা দিলেন যে, অহিংসা সংগ্রামের মধ্য দিয়েও স্বাধীনতা অর্জন করা

সম্ভব। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক হতে বললেন, পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখালেন, সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি প্রচার করলেন। ক্রমে তাঁর শান্তি ও অহিংসার বাণী ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে বিদেশে পোঁছল। তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

গান্ধীজীর যুগে কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে সুভাষচন্দ্র দুবার এই

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বিদেশী শাসকের সঙ্গে আপস করা চলে না, জাতির স্বার্থ ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হয়। ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করাই সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল।

সরোজিনী নাইডু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে আফগানিস্তানের পথে প্রথমে রাশিয়ায় এবং পরে জার্মানীতে গমন করেন। সেখান থেকে তিনি মালয়ে এবং মালয় থেকে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হন। তখন জাপানীরা মালয় ও ব্রহ্মদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেছে। সুভাষচন্দ্র ইংরেজ বাহিনীর দলত্যাগী

ভারতীয় সৈন্যদের সংগ্রহ করে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' বা 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' গঠন করেন। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার উদ্দেশ্যে এই বাহিনী আসামের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই বাহিনীর পরম প্রিয় 'নেতাজী'। গান্ধীজীর ন্যায়

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ

নেতাজীও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ দৃঢ় করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মধ্যে বেশী দূরে প্রবেশ না করলেও এর সাহস ও ঐক্য সমগ্র ভারতে নূতন আশা জাগিয়েছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে নেতাজী এক দুর্ঘটনায় মারা যান বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। নেতাজীর স্বপ্ন সফল হয়েছে, তাঁর দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাঁর বাণী

দেশবাসীর মনে শক্তিসঞ্চার করেছে। তাঁর কীর্তি ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল গান্ধীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক ছিলেন। এই কঠোর সংগ্রামে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও সরোজিনী নাইডু

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রভৃতি দেশমান্য নেতৃবৃন্দ। বহু দুঃখভোগের পর এই অহিংস সংগ্রাম সফল হল, ভারতে ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটল। দীর্ঘকাল পরে ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করল।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক তোমরা—শ্রদ্ধাভরে স্মরণ কর জাতির জনক গান্ধীজীকে, মুক্তিসংগ্রামের নায়ক নেতাজীকে আর সেই সকল শহীদকে যাঁরা আত্মবলি দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

খৃষ্টাব্দ	—১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ : ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত
	—১৮৫৭	সিপাহী বিদ্রোহ : ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম
	—১৮৮৫	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন
	—১৯০৫	বঙ্গবিভাগ
	—১৯২১, ১৯৩০-৩১	মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন
	—১৯৩৯-৪৫	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ
	—১৯৪২	মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন
	—১৯৪৩-৪৫	নেতাজী কর্তৃক 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন ও পরিচালনা
	—১৯৪৭	ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ (১৫ অগস্ট)
	—১৯৪৮	মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান (৩০ জানুআরি)

আলোচনা

১। গান্ধীজীর বাণীর সারমর্ম কি?

২। নেতাজীর জীবনী সম্বন্ধে কি জান?

রাজা রামমোহন রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জন দাশ

বিপিনচন্দ্র পাল